সুষমা মিত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৯

দাম : দু টাকা বারো আনা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

জীবনপথে যাঁদের সান্নিধ্যে এসে আমি
লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি—
যাঁদের আন্তরিক স্নেহে ও উৎসাহে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ভ্রমণের দিনলিপিকা লিখেছি—
আমাদের সেই পরম বন্ধু
শ্রদ্ধেয় কবি-দম্পতি
শ্রীরাধারাণী দেবী
ও
শ্রীনরেন্দ্র দেবের করকমলে
আমার এই ক্ষুদ্র প্রীতির অর্ঘ্য
নিবেদন করলাম।

নিবেদন

প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে যখন এই দিনলিপিকা লিখতে বসি, তখন প্রতিপদেই নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করেছি—এ রূপ বুঝি অক্ষরে ফোটাবার নয়।

সারা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির যে সৌন্দর্যময় লীলানিকেতন, তা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল, তন্ময় করেছিল আমার চিত্তকে। প্রকৃতির ধ্বংসময়ী করালমূর্তির মাঝে অনিন্দ্যসুন্দর নৈসর্গিক রূপের কি অপূর্ব সমাবেশ।

মানব সর্বদেশে সর্বকালে প্রকৃতির মায়াময় রূপে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সভ্যতা আজ আমাদের উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার ক্রোড় থেকে অনেক দূরে এনে ফেলেছে। নানাপ্রকার কৃত্রিম আরামে, কৃত্রিম পরিবেশে ও কৃত্রিম সৌন্দর্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। কিন্তু তবু আজও অতিসভ্য মানুষ তার নাগরিক জীবন থেকে পাহাড় পর্বত অরণ্য নির্ঝরিণী তুষার প্রান্তরের উদার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে গিয়ে পড়লে নিজের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন ওদের ডাক শুনতে পায়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে একদা উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে নিবিড়তম সম্বন্ধ ছিল, আজও বুঝি তার স্মৃতি আমাদের অবচেতন মনের নিম্নতলে সঞ্চিত হয়ে আছে। তাই তুষার-মৌলী পর্বত, ফেন-উন্মত্তা পার্বত্যনদী, নিবিড় ঘন অরণ্য শুধু যে তাদের গম্ভীর মহান্ সৌন্দর্যের আকর্ষণেই আমাদের আকর্ষিত করে হয়তো বা তা নয়। ওদের সঙ্গে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির যে গভীর ঐক্যও আছে, তারই উপলব্ধি

হয়তো বা আমাদের এমন ক'রে ওদের প্রতি টানতে থাকে।

এ দেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য এ দেশের মানব-জীবনের উপর যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনটি বুঝি আর কোনও দেশে দেখা যায় না।

প্রকৃতির দুর্বার আবেষ্টনে রুদ্ধ মানব-জীবন এখানে নানা-রকমে অসহায়, নিরুপায়। পরদেশ-মুখাপেক্ষী দেশের তাই সংগ্রামের আর অন্ত নেই। কিন্তু এ-হেন প্রতিকূলতার মধ্যে বাস ক'রেও দেশের অধিবাসীরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে সমানে তাল রেখে সকল রকম শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে এগিয়ে চলেছে কোথাও একটুও না থেমে। এই সুদূর প্রতীচ্যে পৃথিবীর এক শেষ প্রান্তে উত্তরাপথের রূপমাধুরী আমার মনকে যে-ভাবে স্পর্শ করেছিল, আমি তারই রূপটি আমার লেখনীর মধ্যে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করেছি। দোষ-ত্রুটি ভালো-মন্দ সত্ত্বেও যদি সংবেদনশীল পাঠকগণ এ থেকে কিছু আনন্দ পান, তা হ'লেই আমার শ্রম ও প্রয়াস সার্থক হবে।

আমার এই ক্ষুদ্র দিনলিপিকা পুস্তকাকারে গ'ড়ে তুলতে যাঁদের ঐকান্তিক স্নেহ, যত্ন ও প্রেরণা লাভ করেছি, যাঁরা এই বইখানির প্রকাশ ও মুদ্রণ-ব্যাপারে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি জানাই আমি আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ।

বিনীতা
সুষমা মিত্র

লুসিয়া উৎসব— সুইডেনের বহু প্রাচীন প্রথা। প্রোজ্জ্বলবর্তিকা-কিরীটিনী এক তরুণী আঁধার রাতের কালিমা দূরীভূত ক'রে আলোর প্রতীক সেজেছে।

এক

সবে মাত্র দু'বছর অতীত হয়েছে আমরা 'সাত সমুদ্র তের নদী' পাড়ি দিয়ে সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি পরিক্রমা ক'রে এসেছি। এরই মধ্যে আবার স্বামীর ডাক এল নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক ধাত্রীবিদ্যা সম্মেলনের কোন এক শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করতে। এবার আমার ইউরোপ প্রবাসের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শেষে যখন স্থির হ'ল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যাওয়া হবে নিশীথ রাতের সূর্য দর্শন করতে, তখন বিদেশযাত্রাটা বেশ একটু লোভনীয় হয়ে উঠল।

আকাশবিহার বৈজ্ঞানিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলবার পথে মানুষ যাতায়াতের গতিবেগটাকেও ছুটিয়েছে দ্রুত হ'তে দ্রুততররূপে। আকাশপথচারীর কাছে তাই আজ এই সুবিশাল পৃথিবী সত্যই যেন ছোট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সময় সংক্ষেপ করতে আমরা এবারেও আকাশপথে পাড়ি দিলাম—সাত সাগর পারে পশ্চিমের দেশগুলি দেখতে।

১০ই মে, ১৯৫০ সাল। রাত ১২টায় দমদম বিমানঘাঁটি থেকে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। প্রায় ছাব্বিশ ঘণ্টা বিমানে কাটিয়ে বৃহস্পতিবার শেষরাত্রে লণ্ডনে পৌঁছলাম।

দু'বছর আগে এই একই সময়ে যখন লণ্ডনে পৌঁছাই, তখন যেমন একটা অনিশ্চিত নতুনত্বের আবেগমাখা উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম, এবার আর সে অনুভূতি ছিল না। ১৯৪৭

সালে এপ্রিলের শেষে রাত তিনটের সময় যখন লণ্ডনের হিট্রো বিমানঘাঁটিতে পৌঁছাই, তখন বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। এবারে মে মাসের মাঝে এসে ভোর রাত্রে নেমেও হাড়কাঁপুনি শীত না পেয়ে প্রথমেই একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

লণ্ডনের 'গ্রীন পার্কে'র সামনে এ্যাথনিয়ম কোর্ট (Athenium Court) হোটেলে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ বিকেলেই আমার স্বামী নিউইয়র্ক যাত্রা করবেন। ভারত গভর্নমেণ্ট আমাদের জন্য ডলার মঞ্জুর করেননি, তাই আমি ও কন্যা জয়শ্রী এই দশটা দিন লণ্ডনেই কাটাব।

আমাদের হোটেলের সামনেই 'গ্রীন পার্ক'—সত্যিই শ্যামল শোভায় ঘেরা। সবুজ মাঠের মাঝে মাঝে নানা রঙের টিউলিপগুলি আরো শোভা বর্ধন করেছে। সারা শহর ঘুরে এসে এই পার্কে বসে বেশ আরাম হ'ত।

লণ্ডনের অনেক ডাক্তার-পরিবারের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় ছিল। উনি আমাদের ফেলে নিউইয়র্ক গেছেন জেনে তাঁরা সব স্বামীস্ত্রীতে এসে আমাদের নিঃসঙ্গ লণ্ডনবাস কর্মমুখর ক'রে তুললেন। ডাক্তার রিগ্‌লির (Dr. Wrigly) বাড়িতে চায়ের পার্টি, মিসেস রিগ্‌লির সঙ্গে সিনেমা যাওয়া এবং রিজেণ্ট পার্কের উন্মুক্ত আকাশের নিচে সেক্সপীয়রের নাট্যাভিনয় দেখা —এ সবের ভিতর খুবই আনন্দ ও উত্তেজনা ছিল সত্য, কিন্তু আমাকে বড় শ্রান্ত ক'রে ফেলত। ডাক্তার-কন্যা জোয়ানা

(Joana) জয়শ্রীর সমবয়সী ; সে প্রায়ই জয়শ্রীকে ধ'রে নিয়ে যেত তার স্কুলে।

স্বামীর ফিরবার আগের দিন এখানকার গাইস্ হাসপাতালের (Guy's Hospital) স্ত্রী-চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার ফ্র্যাঙ্ক কুক্ (Dr. Frank Cook) সস্ত্রীক একরাশ সুন্দর গোলাপ নিয়ে এসে আমায় বল্লেন—"কাল ডাক্তার মিত্রকে একটি সার্প্রাইজ (surprise) দেব। আমি তার জন্য সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছি। তাঁকে আমার হাসপাতালে একটি ক্যান্সার রোগী অপারেশন করতে হবে।"

এই সব পরিবেশের মধ্যে যখন সত্যিই হাঁপিয়ে উঠতাম, তখন সত্যিকার বিশ্রাম পেতাম অধুনা লণ্ডনবাসী ডাক্তার, আমার স্বামীর প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীমান অমিয় বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রীর লৌকিকতাবর্জিত খাঁটি বাঙালী ব্যবহারে। তাঁদের গাড়িতে সবাই মিলে শহরের বাইরে গিয়ে উপভোগ করতাম গ্রামাঞ্চলের স্নিগ্ধ শোভা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম কেণ্টের (Kent) মাঠেঘাটে শুনেছি বিহগকাকলী। সাউথ এণ্ডের (South End) সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি সাগরবক্ষে সূর্যাস্তের আরক্তিম শেষ রশ্মিরেখা। প্রায় রোজই আমাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা ছিল ডাক্তার-গৃহে। এঁদের আদর-যত্নে ভুলে গিয়েছিলাম যে প্রবাসে একা আছি।

লণ্ডন ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে ওখানকার বেতারবার্তার ভারতীয় বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমান কমল বোস এসে বল্লেন

—B. B. C. থেকে কিছু বলতে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নিশীথ-সূর্য দেখে এসে বলব ব'লে এবারের মত বিদায় নিলাম।

এই দু'বছরে লণ্ডনের কি অভিনব পরিবর্তনই না দেখছি। যুদ্ধোত্তর লণ্ডন যে এত শীঘ্র এমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। ইংরেজ জাত-ব্যবসায়ী বটে! এই ব্যাবসা বাণিজ্যের ভিতর দিয়েই আজ আবার এত শীঘ্র তারা ভাঙনের পথ থেকে ফিরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লণ্ডনের দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পথে-ঘাটে আলোর মেলা; শহর আমোদে সরগরম। খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট উন্নতি এখনও না হ'লেও পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে পুষ্টিকর খাদ্য সকলেই পাচ্ছে। শহরবাসীদের মুখ হাসিভরা। সারা দেশময় যেন আবার নতুন ক'রে বাঁচবার সাড়া পড়ে গেছে। বিশ্বের মাঝে মানুষের মত বাঁচতে এরা বদ্ধপরিকর।

দুই

স্টকহলমের পথে—

২৭শে মে, বেলা তিনটের সময় আমরা S. A. S.-এর বিমানে স্টকহলম রওনা হলাম। আকাশ মেঘলা, বায়ু প্রতি-কূলগামী। বিমান স্তরে স্তরে মেঘের স্তবকপুঞ্জ ভেদ ক'রে 'নর্থ সী' পার হয়ে এল। দ্বীপবহুল ডেনমার্কের উপর দিয়ে উড়ে এসে সুইডেনের পশ্চিম তীরে 'গোটেবুর্ক' বন্দরে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়াল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর আবার উড়ে চলল আকাশ-পথে সুদূর মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে।

সুইডেন পার্বত্য প্রদেশ; অরণ্য, হ্রদ ও নদীতে ভরা। সারা দেশে চাষের সমতল জমি খুব কমই চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভূভাগ উর্বর ও সমতল। স্কেন (Skane) প্রভিন্সের মাটি সবুজ আস্তরণে ঢাকা, ছোট ছোট ক্ষেতগুলি শস্যে পরিপূর্ণ। দেশের মধ্যভাগ অবধি হ্রদের ধার বরাবর শ্যামল ক্ষেতের সারি।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে আমরা স্টকহলমের মাটিতে নেমে দাঁড়ালাম। হোটেল প্লাজায় উঠেছি। দু'বছর আগে যে ঘরখানিতে ছিলাম, এবারেও সেই ঘরখানি পেয়েছি। পরিচিত ঘর পেয়ে জয়শ্রীর আর আনন্দ ধরে না।

২৮শে মে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙেছে। ঘড়িতে দেখি সবেমাত্র তিনটে বাজে। সুতরাং জানালায় পরদা টেনে সূর্যদেবকে ঢেকে দিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। বেলায়

প্রাতরাশ খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। দেখি শহর প্রায় জনহীন। আজ "Whit Monday"—যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণ দিবস। তাই শহরবাসী গেছে গ্রামাঞ্চলে ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে।

স্টকহলমে হ্রদের ধারে ভারতীয় জাতীয় পতাকা

আমরা প্রথমেই গেলাম প্রফেসার হেম্যানের (Prof. Heyman) কন্যা মিসেস থোরিয়ানের (Mrs. Thorean) সঙ্গে দেখা করতে। ছুটির দিনে মিসেস থোরিয়ান স্বামী-পুত্র-কন্যা সহ বেশ আরাম ক'রে প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই আনন্দে উৎসাহিত হয়ে জয়শ্রীকে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সংসার ও পুত্রকন্যার ভার, স্বামীর উপর দিয়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মোটর লঞ্চে ক'রে শহর ঘুরতে।

স্টকহলমকে বলা হয় 'উত্তরের ভেনিস'—হ্রদে গাঁথা শহর। ম্যালারণ হ্রদ ও বল্‌টিক সাগরের মিলনস্থলে ছোট ছোট দ্বীপ-পুঞ্জের উপর শহরটি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জলে ও স্থলে উভয়-পথেই শহর প্রদক্ষিণ ক'রে আসা যায়।

নয়নাভিরাম শহরের ছবি। মাধুর্যময়ী প্রকৃতি বুঝি সৌন্দর্য-ভাণ্ডার উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে এইখানে। মোটর বোট দ্বীপ ঘুরে ঘুরে চলল। তীরের উপর পাইন গাছের ছায়ায় ঘেরা কুঞ্জকুটীরগুলি দেখতে অতি মনোরম। শীতের পর বসন্তের আমেজ লেগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় সবুজ নেশার মাতামাতি। মলয় বাতাসের হিল্লোলে পল্লবী হেলে দুলে পাতার ঝঙ্কারের মাতন তুলেছে। শহরের স্থানে স্থানে কোথাও বা দু'টি হ্রদের মাঝখানে খাল কেটে জলপথকে যুক্ত করা হয়েছে বরাবর সাগর অবধি; স্থলপথকে যুক্ত করা হয়েছে উপরে অসংখ্য সেতু বেঁধে।

প্রাচীন স্টকহলমের পথ-ঘাট খুবই অপ্রশস্ত। সরু অন্ধকার গলির দু'ধারে সাবেকী ধরনের ঠেসাঠেসি বাড়ি। নবনির্মিত শহরতলীতে এসে দেখি, দু'ধারে পাইনগাছের সুরম্য উদ্যান, তার ফাঁকে ফাঁকে গ'ড়ে উঠেছে আধুনিক পল্লীগুলি। প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে মনোরম অট্টালিকার সারি। ছোট ছোট শিশুরা বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। আবালবৃদ্ধবনিতা বাগানে ব'সে আছে সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বে মুখ তুলে; তাদের গাত্রচর্মকে রৌদ্রতপ্ত ক'রে পুড়িয়ে নিতে সবাই বিশেষ ব্যস্ত। শহরের এই নতুন পল্লীগুলিতে মুক্ত আলো-হাওয়া চলাচল

করে অবাধ গতিতে। প্রকৃতির এখানে মৃত্যু ঘটেনি, ঘটেছে মুক্তি।

শহর প্রদক্ষিণ করার পর মিসেস থোরিয়ান আমাদের এখানকার স্টারেবাই হোমটি (Stureby Home) দেখাতে
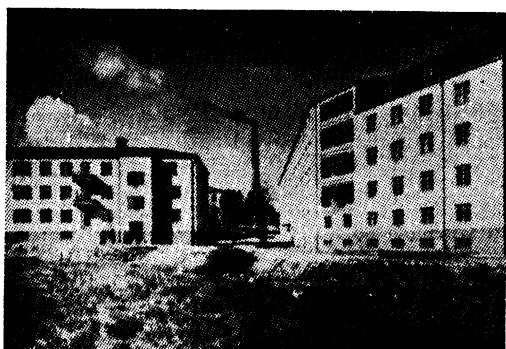
অস্তাচলগামী জীবনের শেষ নীড়

নিয়ে গেলেন। এটি হ'ল এ দেশের দুঃস্থ অকর্মণ্য বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শেষ জীবনের একটি আশ্রয়। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ৭১০ জনের বাসের ব্যবস্থা ; তার মধ্যে ৩৩৬ জন একেবারে অকর্মণ্য শয্যাশায়ী রোগী এবং অবশিষ্টরা অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় কিন্তু নিঃস্ব, সহায়সম্বলহীন। এঁরা অল্প-স্বল্প বাগানের কাজ ক'রে থাকেন এবং সেলাই, ধোলাই, রিপুকর্ম প্রভৃতি ক'রে প্রতিষ্ঠানকে কিছু আয়ের সহায়তা করেন। এইভাবে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ এই আশ্রমে বাস ক'রে জীবনের শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে

যান। ফলে এই জাতীয় জরাজীর্ণ রোগীর ভিড়ে হাসপাতাল আর ভ'রে ওঠে না।

কথা-প্রসঙ্গে মিসেস থোরিয়ান বললেন— এ দেশে এ ভিন্ন বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আরো বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে নব আদর্শে গঠিত গোল্ডেন ওয়েডিং হোমটি (Golden Wedding Home) আবার সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আশ্রমে নিঃস্ব ও বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী আপন সংসার পেতে পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে একত্রে বাস ক'রে বাকি জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

পৌরসঙ্ঘ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরো একটি আবাস-কেন্দ্র। পেনসনভোগী স্বল্পবিত্ত বৃদ্ধ দম্পতীর বসবাসের জন্য শহরের আশেপাশে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ ক'রে নতুন পল্লী গঠন করা হয়েছে। কুটীরগুলি নামমাত্র ভাড়ায় এই সব পরিবারদের বাসের জন্য দেওয়া হয়। এই বাড়িগুলির ভিতরে দেওয়া থাকে সমুদয় গৃহস্থালির ব্যবহার্য বস্তু, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রটি হ'তে ইলেকট্রিক উনানটি পর্যন্ত।

প্রকৃতপক্ষে স্টকহলমে এখন আর কোথাও কোন স্থানে দরিদ্রপল্লী বা বস্তিপাড়া ব'লে কিছু নেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও রুচি বদলে চলেছে। জীবনযাপনের মান উন্নীত হচ্ছে ক্রমেই। দেশবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টায়, গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় ও পৌরসঙ্ঘের সততাপূর্ণ প্রচেষ্টায় দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য বহুলাংশে দূরীভূত হয়ে এক কল্যাণকর সমাজ গ'ড়ে উঠেছে।

দেশের মানুষের জন্য যে-দেশ এমনিভাবে প্রাণঢালা সেবাযত্ন করতে তৎপর—'দেশবাসীর জন্যই দেশ'—এ নীতি অক্ষরে অক্ষরে যে-দেশ পালন করে, সে-দেশ সত্যই সকলের আদর্শস্থানীয়।
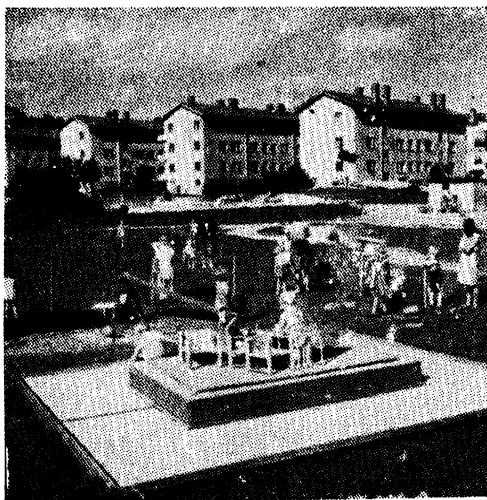
পৌর শাসন বিভাগ-নির্মিত সুন্দর শ্রমিক-পল্লী

ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে পাছে বাসগৃহের অকুলান ঘটে, এই আশঙ্কায় পৌরপ্রতিষ্ঠান হতে বহুপূর্বেই নতুন পল্লীর নক্সা তৈরি হয়ে গৃহনির্মাণ কার্য সুরু হয়ে গেছে। মিসেস থোরিয়ান বল্লেন—এ দেশে পৌরপ্রতিষ্ঠানের পৌর-পরিষদের একশত জন সদস্যের মধ্যে বাইশ জন রয়েছেন মহিলা।

তিন

২৯শে মে। সকালে সবেমাত্র প্রাতরাশ শেষ হয়েছে, এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম এল। জার্মানীর প্রফেসার মার্টিয়াসের (Prof. Martius) কাছ থেকে জরুরী নিমন্ত্রণ, যে, ফিরবার পথে গোটিংএন ইউনিভার্সিটিতে (Gottingen University) ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। সেখানে থাকবার ও যাতায়াতের ভার তিনিই নেবেন। টেলিগ্রাম পেয়ে উনি বেশ একটু উতলা হয়ে পড়লেন।

জার্মানী যাবার পরিকল্পনা আমাদের প্রোগ্রামে ছিল না; সেজন্য পূর্ব থেকে জার্মানীর 'ভিসা'ও নেওয়া হয়নি। এখন এই 'ভিসা'র হাঙ্গামা করতে হ'লে এখানকার ভারতীয় দূতাবাসে যেতে হবে, যার জন্য উনি একটুও ইচ্ছুক নন। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব সুখপ্রদ ছিল না।

লণ্ডন-প্রবাসের সময় পরিচিত অপরিচিত ভারতীয়ের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাইনি। তবুও অবুঝ মন আমার একাকী লণ্ডনবাসের দিনগুলোতে ইংরেজ বন্ধুদের আতিথেয়তার চেয়েও দেশছাড়া ভারতীয় প্রবাসীর খোঁজ নেওয়ার জন্যই উন্মুখ হয়েছিল। ভারতীয় দূতাবাসের মহারথিবৃন্দকে বিশেষ কর্মব্যস্ত মনে ক'রে উনি আর দূতাবাসে গিয়ে তাঁদের বিরক্ত করতে চাননি। স্বাধীন ভারতের ভারতীয় ভাবধারাটুকু যে বড় বড় সরকারি ইমারতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, সেটা তখনও

ঠিক উপলব্ধি করিনি। যা'হোক, শেষ পর্যন্ত আমরা এই সব দেশী বড় সাহেবদের ঘাঁটিগুলি একটু এড়িয়েই চলতাম।

এ-হেন অবস্থায় কি করা যায়—এই নিয়ে যখন আমরা জল্পনা-কল্পনা করছি, এমন সময় আমাদের স্টকহল্‌মের বন্ধু-

স্টকহলমে হ্যারিস পরিবারের সঙ্গে

পরিবার মিস্টার ও মিসেস হ্যারিস (Mr. & Mrs. Harris) এসে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি আমাদের জার্মানী যাবার 'ভিসা' নেই শুনে বল্লেন—"আপনাদের কিছুই করতে হবে না। আপনারা মিসেস হ্যারিসের সঙ্গে স্ক্যানসন্ মিউজিয়াম (Skansen Museum) দেখতে যান। ফিরে আসবার পূর্বেই আপনাদের জার্মানীর 'ভিসা' আনিয়ে রাখব।"

স্ক্যান্‌সন মিউজিয়াম শহর থেকে বেশ একটু দূরে উন্মুক্ত পর্বতচূড়ায় অনেকখানি জমির উপর অবস্থিত। বহু শতাব্দী পূর্বে সাবেক কালের মানুষের জীবনযাত্রার নিদর্শনস্বরূপ কাঠের

গৃহগুলি সুইডেনের নানাস্থান হ'তে সংগ্রহ ক'রে তুলে এনে এই অনাবৃত সংগ্রহশালায় সযত্নে রাখা হয়েছে। এই সব কুটীরগুলির ভিতরে গৃহস্বামীর যাবতীয় ব্যবহৃত আসবাব, ঘরকন্নার জিনিষগুলি মায় কাঠের কাঁটা চামচ থালা বাটি এমন কি পাতকূয়া হ'তে জলতোলার কাঠের বাল্‌তিটি পর্যন্ত যথাস্থানে সাজানো। সেকালের পোষাক-পরিচ্ছদে শোভিতা এক মহিলা ঘরের সব জিনিষপত্তর দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

পুরাকালের কাঠের গৃহগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে যেন কত শত শতাব্দীর আগের যুগে আমরা ফিরে গেছি। সামনেই সেই প্রাচীন মানুষদের জীবনযাত্রা—তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, দেশাচার, রীতিনীতি—সুখদুঃখে জড়ানো সেই দিনগুলি। কল্পনাতীত অদ্ভুত এ পরিবেশ। মনের মাঝে ছাপ দিয়ে যায় অতীতকালের সেই মানুষের রূপটি। বহুকাল পূর্বে সেদিনের সে-পৃথিবী আজকের এই পৃথিবীই ছিল, কিন্তু তখন মানুষের জীবনধারা ছিল কত অন্য ধরনের। এই স্ক্যান্‌সনে যেন সুইড্‌দের পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আজকের এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজও প্রভূত আনন্দ পাচ্ছে।

সুইড্‌দের একটি সাবেকি প্রথা—লুসিয়া সেলিব্রেসন (Lucia Celebration) উৎসবটি আজও দেশে অনুষ্ঠিত হয়। 'লুসিয়া'—আলোর প্রতীক। ১৩ই ডিসেম্বর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে প্রোজ্জ্বলবর্তিকাকিরীটিনী এক সুন্দরী

তরুণী সভা আলো ক'রে উপস্থিত হন ; নৃত্যে গীতে বাদ্যে মেতে ওঠে জনসভা।

আরেকটি প্রাচীন প্রথা হ'ল—'মে পোল' (May Pole) ঘিরে নৃত্যানুষ্ঠান। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে প্রচুর সূর্যালোকের

মোরা গোলাবাড়ি

মাঝে পত্রপুষ্পশোভিত May Poleটি ঘিরে মহানন্দে লোক-নৃত্যের উৎসব চলে।

এখানকার কাঠের 'মোরা' গোলাবাড়ি (Mora farm-stead) ওকটার্পের (Oktarp) খোড়ো ছাউনির ঘর ও কায়ার্কের (Kyrk) ঘাসের চাবড়ার ছাউনি ঢাকা কুটীরগুলি দেখে অতি ক্লান্ত হয়ে আহারের সন্ধানে রেস্টুরেণ্টে গেলাম।

পথে দেখলাম ল্যাপদের কাঠের তাঁবুটি। মিসেস হ্যারিস বল্লেন, শীতকালে একটি ল্যাপ-পরিবার এইখানে এই তাঁবুটিতে বাসও করে।

স্ক্যান্‌সনের রেস্টুরেণ্টটি অতি চমৎকার। অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি শৈলশিখরের উপরে বড় বড় কাঁচের দরজা জানালায় পরিবেষ্টিত সুন্দর একটি কাঠের বাড়ি। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেও বহু চেয়ার টেবিল পাতা রয়েছে। চারিধারে ঝলমলে রং-এর সতেজ গোলাপ, টিউলিপ, প্যান্‌জি ও ডালিয়া ফুলের বাগান, স্নিগ্ধ সৌরকিরণে আরো সজীব ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্যানাডায় নায়গ্রা জলপ্রপাতের সামনে টেরাস-রেস্টুরেণ্টের ফুল-বাগানটি আমার খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু স্ক্যান্‌সনের এই উদ্যানটি তাকেও হার মানিয়েছে। সাবেকি ধাঁজের সুইডিশ পোষাক-পরিহিতা আহার সরবরাহকারিণী উৎকৃষ্ট খাদ্য দিয়ে আমাদের তৃপ্ত করল।

অদূরে জমকালো ইউনিফর্ম-পরা ব্যাণ্ড-বাজিয়ের দল শনৈঃ শনৈঃ আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে সুইডিশ পল্লীসঙ্গীত বাজিয়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনে এবং অবসর সময়ে এই মনোহর পরিবেশের মধ্যে অলসবিশ্রাম উপভোগ করা ও উন্মুক্ত শৈল-শিখরে স্নিগ্ধ রৌদ্রতাপে শ্বেত অঙ্গকে তাম্রবর্ণ ক'রে নেওয়া শহরবাসীদের বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ক্যান্‌সনে সারাবেলা অতিবাহিত ক'রে বিকেলে হোটেলে ফিরে এলাম।

আজই রাতে আবার হ্যারিস-পরিবার আমাদের ডিনারে

নিমন্ত্রণ করেছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁরা হোটেলে এসে উপস্থিত। মিস্টার হ্যারিস গাড়ি চালিয়ে সকলকে নিয়ে চললেন প্রাচীন শহরের দিকে। অন্ধকারময় সরু পাথরের পথ, দু'ধারে বাড়ির প্রাচীর। গলির পর গলি পেরিয়ে ছোট্ট একটি রেস্টুরেন্টের সামনে মোটর থামল।

আমরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে ছোট্ট সরু একটি কালো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভে গুহার মধ্যে উপস্থিত হ'লাম। গুহায় জানালার বালাই নেই; শুধু ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মাঝে অসমান কালো গ্র্যানাইট্ পাথরের দেওয়াল ঘিরে চারিদিকে জ্বলছে সারি সারি ঝাড়বাতি; আলোর নিচে সাজানো রয়েছে ছোট ছোট টেবিলগুলি। ঘর ভরা লোক, সকলেই খেতে ব্যস্ত। খাদ্যগুলি অতি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। আমাদের ঠিক সামনে দু'ধাপ নিচে আরেকটি গুহাতে বেশ বড় রকমের একটি ভোজপর্ব চলছে। ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিল ঘিরে ব'সে জন পঞ্চাশ পুরুষ ও মহিলা আহারের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে মাঝে মাঝে সঙ্গীতলহরী তুলছেন। পাথরের দেওয়ালে দ্বিগুণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুরের ঝঙ্কার।

অতিপ্রাচীন এই সরাইখানাটির নাম—গিল্‌ডেন ফ্রেডন ("Den Gyldene Freden"—The Golden Peace); সরাইখানাটি তিনশ' বছরেরও অধিক পুরাতন। সুপ্রসিদ্ধ কবি কার্ল মাইকেল বেলম্যানের (Carl Michæl Bellman) অতিপ্রিয় খাবার ঘর ছিল এই 'Freden' সরাইখানাটি। এখানকার এই স্তব্ধ গুহার নিভৃত কোণের

অভিনব রহস্যময় রূপটি কবিমনকে মুগ্ধ করত। কবি এইখানে ব'সে কাব্যরসে অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করতেন কত গান, কত কবিতা, কত ছন্দ। কবি বেলম্যান শান্তিবাণীর কবি 'Poet of Peace' নামে খ্যাত। তাঁর রচিত গানগুলি আজও দেশবাসীর নিকট অতি প্রিয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কবির জন্মদিবসে প্রতি বৎসর দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, কবি ও সাহিত্যিকগণ শ্রদ্ধেয় কবির স্মরণার্থে এই সরাইখানায় সমবেত হন।

চার

৩০শে মে। সকালে গেলাম 'সিটি হল' (City Hall) দেখতে। এ দেশের টাউন হল্‌কে বলে 'সিটি হল'। এই 'সিটি হল' স্টকহলমবাসীদের বিশেষ গর্বের জিনিষ।

ম্যালারণ হ্রদের পাড়ে অনেকখানি জায়গার উপরে 'সিটি হল' প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের মাঝে দেশনেতা এঙ্গলব্রেক্টের (Engelbrecht) বিরাট মর্মর মূর্তি স্থাপিত। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদেশী প্রভুর কবল হতে দেশকে মুক্ত ক'রে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। 'সিটি হলে' বিশিষ্ট সভাসমিতির জন্য বিভিন্ন রকমের বড় বড় হল রয়েছে। তার মধ্যে সোনালি মোজাইকের দেওয়াল গাঁথা জমকালো গোল্ডেন হল্‌টি (Golden Hall) বিশেষ দ্রষ্টব্য। ঘরের একটা দিকে দেওয়াল ভ'রে আঁকা নারীমূর্তিটি স্টকহলম নগরীর প্রতীক। প্রিন্স ইউজেনের (বর্তমান রাজার খুল্লতাত) আঁকা বড় বড় তৈলচিত্র প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে একটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পূর্বে কথা ব'লে বন্দোবস্ত করা ছিল। শহরের বাইরে খোলা মাঠের মাঝে বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষয়িত্রী সাদরে আমাদের বিদ্যালয় দেখালেন। ক্লাশের ছাত্রীরা নতুন দেশের নতুন মানুষ দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ দেশের শিক্ষাবিষয়ক বহু তথ্য শিক্ষয়িত্রীর নিকট শুনলাম।

সুইডেনে ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা আরম্ভ করতে হয় সাত বৎসর বয়সে। বাধ্যতামূলক পাঠ্যকাল সাত বৎসর। জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরো কত সহজলভ্য করা যেতে পারে সে বিষয়ে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ বহু গবেষণার পর একটি নতুন শিক্ষাসংস্করণ খাড়া করা হয়েছে ; শীঘ্র তার প্রচলন সুরু হবে।

এই নতুন নিয়মে প্রাথমিক শিক্ষার সময় সাত বৎসরকে নয় বৎসর করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে বেতন দিয়ে পড়তে হবে না ; পরন্তু কৃতী ছাত্রছাত্রী জলপানি পাবে। প্রত্যেককে বই খাতা পেন্সিল দেওয়া হবে, টিফিন খেতে পাবে এবং যারা দূরে থাকে, তাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য এর অনেকগুলিই কমবেশি বহুদিন থেকে প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি এই সমস্ত নিয়মগুলি কার্যকরী করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হ'লে Gymnasium অর্থাৎ সিনিয়র হাই স্কুলের পরীক্ষা পাশ করতে হয়। এই পরীক্ষা এ দেশের সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা—আমাদের বি. এ. পরীক্ষার সামিল। এই পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রদের খুবই গর্বের বিষয়। বেশির ভাগ ছাত্রই বিশ বছর বয়সে জিম্‌নেসিয়াম পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে সরকারী ও বেসরকারী নানা বিভাগে ভালো চাকুরি পায়।• শিক্ষয়িত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় তিনিও উত্থাপন করলেন মেয়েদের সেই সনাতন সার কথা—শাড়ি ও গহনার উচ্চ প্রশংসা।

ফেরার পথে একটি রেস্টুরেণ্টে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারা গেল। সাগরের নোনা মাছের ডিশগুলি খেতে অতি সুস্বাদু। সুইডদের অতিকায় দেহানুপাতে আহারের পরিমাণও তদনুরূপ। আমরা তো একটি ডিশ নিয়ে তিনজনে ভাগ ক'রে খেয়েও শেষ করতে পারলাম না। দেখলাম, সামনের ভদ্রলোকটি পুরোপুরি ভুরিভোজন ক'রে আহারান্তে খেলেন একবাটি আধসের পরিমাণ দই। এই Yogot অর্থাৎ দধি সুইডদের অতিপ্রিয় খাদ্য।

আজ বিকেলে সেবাট্‌স্‌বার্গ (Sabbatsberg) হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাক্তার ভেটারডলের গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ।

হাসপাতালে ভেটারডলের অস্ত্রোপচার দেখে উনি উচ্চ প্রশংসা করলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা জানা কমই ছিলেন। সকালে আমাদের স্কুল দেখার উৎসাহের কথা শুনে জনৈক ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের নার্শারি স্কুলটি দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছ থেকে এ দেশের শিশু-কল্যাণ সমিতি ও নার্শারি স্কুলের বিবিধ ব্যবস্থার বিষয় শুনলাম।

এদেশে Child Welfare অর্থাৎ শিশুকল্যাণ সাধনের আন্দোলন কিছুকাল যাবৎ দেশময় চলেছে। ১৯২৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যে, প্রত্যেক জেলায় শিশু-কল্যাণ সাধনার্থে একটি ক'রে শিশুকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকে যারা শিশু, কালে তারাই হবে ভবিষ্যৎ-জাতি; সুতরাং তাদের জীবন-গঠনের দায়িত্ব দেশেরই। এই শিশু-জীবনের ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠলে

তবেই গ'ড়ে উঠবে আদর্শ জাতি, নচেৎ জাতি নামবে অবনতির ধাপে।

এই শিশুকল্যাণ সমিতির একটি বিশেষ কাজ হ'ল—বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের লালনপালনের খবরাখবর নেওয়া, শিশুর মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানপালন সম্বন্ধে সৎপরামর্শ করা, প্রয়োজন ক্ষেত্রে খাদ্য, অর্থ, চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সর্বতোভাবে সাহায্য করা। মাতাপিতা সন্তান-পালনে অযোগ্য হ'লে কিম্বা দুষ্টমতি বালকের পক্ষে গৃহে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব দেখলে সমিতির তরফ থেকে সেই সকল শিশুকে মাতাপিতার অমত সত্ত্বেও স্থানান্তরিত করা হয় প্রটেক্‌টিভ্‌ আপব্রিঙ্গিং হোমে (Protective Upbringing Home)। সমিতির এই কাজের পিছনে আছে গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা। শিশুকল্যাণ সমিতির অধীনে এ ছাড়াও Youth Home, Occupational Home প্রমুখ বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে শিশুরা শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়ে এদেরই সাহায্যে নানা বিভাগে চাকুরি লাভ করে।

শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষায় যে-জীবন হেলায় হারাত, সে-জীবন হয়ে ওঠে সফল কর্মরত। এমনি ক'রে শিশু-চরিত্রে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিশু হয় পূর্ণ দায়িত্বশীল নাগরিক।

৩১শে মে। আজ সকালে সবাই গেলাম কারোলিঙ্ক (Carolinsk) হাসপাতালে। উনি ডাক্তারদের সঙ্গে কাজে বসলেন দেখে আমরা মেট্রন মিস বোল্টকে নিয়ে হাসপাতাল ঘুরে দেখতে গেলাম।

ক্যারোলিন্‌স্‌ক (Carolinsk) হাসপাতালে রেডিয়ামহেমেট্‌ (Radiumhemmet) ক্যানসার চিকিৎসাগারটি বিশ্ববিখ্যাত। প্রফেসার হেম্যান (Prof. Heyman) এবং প্রফেসার বেরভ্যানের (Prof. Bervan) সঙ্গে আমাদের এর আগের

রেডিয়াম হেমেট হাসপাতালের সম্মুখে প্রফেসার বেরভ্যান

বারই বেশ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। প্রফেসার হেম্যান আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধাত্রীবিদ্যা কংগ্রেস থেকে ওঁর সঙ্গে একই সময়ে ফিরেছেন। প্রফেসার বেরভ্যান্‌ এই রেডিয়াম হেমেটের ডিরেক্টর ; সম্প্রতি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। এত বড় প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ও শ্রেষ্ঠ ক্যানসার চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা এবং আদর আপ্যায়ন করলেন, তাতে মনে হ'ল যেন কতকালের পরিচিত এবং আমাদেরই একজন। মহতের প্রকাশই অনন্যসাধারণ! প্রফেসারের ঘরে ব'সে চা পানের সময় দেশ-বিদেশের অনেক

গল্পই হ'ল। মিস বোল্ট তাঁর সোস্থাল কর্মবিভাগের (Social Service) কার্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। এ-দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই বললেন।

শুধু এই স্টকহলমেই ত্রিশটি হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে সর্বসমেত রোগীর বিছানা হবে প্রায় সাড়ে তের হাজার। মাত্র সাত লক্ষ বাসিন্দার জন্য এতগুলো হাসপাতাল এবং এতগুলো বিছানা শুনে অবাক্ হ'লাম। সম্প্রতি আবার বার শত রোগীর বিছানাযুক্ত অতিআধুনিক ধরনের একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, নাম সোডারজুখাসেট (Soderejukhuset)। এই হাসপাতালটি প্রগতিশীল আমেরিকার অভিনবত্বকেও হার মানিয়েছে। আর সব চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জনসাধারণের পক্ষে এই সব হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়া মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। দৈনিক সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার ক্রোনে অর্থাৎ আমাদের প্রায় চার টাকায় হাসপাতালে থাকা, খাওয়া এবং যাবতীয় চিকিৎসার সুবিধা, মায় এক্সরে ছবি তোলা পর্যন্ত, পাওয়া যায়। রোগী-পিছু অবশ্য খরচ পড়ে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু এর জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ ব্যয় করেন বাৎসরিক সাত কোটি টাকা অর্থাৎ মাথা-পিছু একশত টাকা ক'রে।

মানুষের মন স্বভাবতই তুলনাপ্রয়াসী। আমাদের স্বাস্থ্য-বিভাগের সঙ্গে তুলনা ক'রে যখন আমি জিজ্ঞাসা করি, উনি বলেন—"আজ থাক, হাজার বছর পরে তুলনা কোরো।"

পাঁচ

উত্তর-মেরু পথে—

১লা জুন। উপসালার পথে। স্টকহলম থেকে ট্রেনে ক'রে উপসালা পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগল। শহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। উপসালা সুইডেনের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র এবং অতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জগদ্-

উপশালা ইউনিভার্সিটির সম্মুখ ভাগ

বিখ্যাত। এক কথায়, উপসালাকে সুইডেনের কেম্ব্রিজ বলা যায়। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু সুইডেন নয়, পৃথিবীর সর্বত্র হ'তে বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, দর্শন এবং বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান-বিভাগে শিক্ষা লাভ ক'রে কৃতী ও যশস্বী হয়েছেন। যে অ্যাটম-বোমা আজ সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় ক'রে

তুলেছে, তার প্রাথমিক গবেষণা অর্থাৎ আণবিক শক্তিকে তেজোময় করবার প্রচেষ্টা এই উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারেই শুরু হয়। সুইডেনে মাত্র সত্তর লক্ষ লোকের জন্য আরো তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

বিশ্বের দরবারে শিক্ষার মর্যাদা সুইডেন বরাবরই পেয়ে এসেছে এবং বিশ্বকে মর্যাদা দিয়েও এসেছে নোবেল পুরস্কারের (Nobel Prize) ভিতর দিয়ে। এমন কি এই সুদূর ভারতও তাদের দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমনকে নোবেল জয়মাল্য-ভূষিত (Nobel Laurels) ক'রে ভারতবাসীকে মুগ্ধ করেছে।

২রা জুন। রাত ৯টার ট্রেনে আমরা উপসালা ছেড়ে নার্ভিক অভিমুখে রওনা হ'লাম। রিজার্ভ-করা কুপেতে পরিষ্কার বিছানায় আরামে ঘুমনো গেল।

রাত প্রায় দু'টোয় ট্রেন স্টেশনে থামতে আমার ঘুম ভেঙেছে। জানালার পরদা একটু ফাঁক ক'রে দেখি—সুপ্রভাত, সূর্যকিরণে দিক উদ্ভাসিত।

ট্রেন ছুটে চলেছে অরণ্যাকীর্ণ পার্বত্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড শীতে বিছানা ছেড়ে ওঠা দায়। উত্তরমেরু অভিমুখে যতোই এগিয়ে চলেছি, শীতের প্রকোপ ততোই তীব্র অনুভূত হচ্ছে।

বেলায় প্রাতরাশ খেয়ে জানালার ধারে আরামে সোফায় ব'সে বাইরের দৃশ্য দেখছি। ট্রেন এঁকে বেঁকে ভুজঙ্গভঙ্গিতে পাহাড়তলীর উপর উঠে চলেছে। দেখতে দেখতে নেমে এল

উপত্যকার মাঝে—ঘনকৃষ্ণ বনানীর ছায়ায়। গুরু গম্ভীর গম্-গম্ শব্দে পর্বতগাত্রের মধ্যে টানেলের পর টানেল পার হয়ে চলল। দিবারাত্র সারাক্ষণ ট্রেনের কামরায় আলো জ্বলছে, নচেৎ ক্রমাগত এই অন্ধকার পর্বতগহ্বরের সুড়ঙ্গপথে দীর্ঘ বিশ বাইশ মিনিট পর্যন্ত থাকা খুবই অস্বস্তিকর হ'ত। খেলা-ঘরের মত ছোট ছোট স্টেশন। লোকবসতি এখানে ওখানে অল্প-স্বল্প, ছড়ানো।

মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ শব্দে। তাপ নামছে ধীরে ধীরে। ট্রেনের গরম-করা ঘরে ব'সেও শীতে হাত পা জ'মে যাবার জোগাড়। পায়ে ডবল মোজা ও গায়ে যথেষ্ট গরম জামা প'রেও শীত মানে না, তার উপর আবার ওভারকোট প'রে বসেছি।

দিগন্তবিস্তৃত প্রস্তরসঙ্কুল মালভূমি মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে। দেখতে দেখতে আমরা অধিত্যকার উপর উচ্চ গিরিমালার পাদমূলে উপস্থিত হ'লাম। ট্রেন পর্বতপ্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। (চারিদিকে শুধু অগণিত তুষারকিরীট গিরিশৃঙ্গ। মনে হয়—ধরিত্রী যেন শতবাহু প্রসারিত ক'রে ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে শ্বেতপদ্মের পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছে।)

নির্জন স্তব্ধ পার্বত্যপুরী। শুধু কাঁকর-ভরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে সারি সারি শুক্‌নো সরু ডালপালামেলা পল্লবহীন গাছগুলি। শীতে তুষারের ঝড়ে সব হারিয়ে এরা হয়েছে রিক্ত নিঃস্ব পথের পথিক। পাশে শুধু গর্বভরে সবুজ রং ফলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছের সারি।

প্রকৃতির মন-মাতানো রূপে চিত্ত তন্ময় হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে নিসর্গ-দৃশ্যপটে নব নব রূপের আবির্ভাব। মৃন্ময়ী ধরিত্রী যেন এখানে চিন্ময়ীরূপিণী। মনে বিস্ময় জাগে—যে-মাটির পৃথিবীতে আমরা বাস করি, এ কি সেই পৃথিবী! এ দেশে সূর্য ওঠে গভীর রাতে, রাতের আকাশ ঢাকে গোধূলির ম্লান আলোয়।

পাহাড়তলীতে বনরাজিপূর্ণ উপত্যকার মাঝে ছোট ছোট গ্রামের স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে। সুইডেনের মধ্যভাগে জ্যেমট্‌ল্যাণ্ড (Jamtland) প্রদেশ পেরিয়ে আমরা ল্যাপ-ল্যাণ্ডে (Lapland) এসে পড়েছি। ল্যাপল্যাণ্ড প্রদেশটি নরল্যাণ্ড (Norrland) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সুইডেনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ এই ল্যাপল্যাণ্ড।

সুইডেন দেশটি প্রায় হাজার মাইল ব্যাপী লম্বা এক ফালি জমি। দেশের পশ্চিম সীমানা জুড়ে উচ্চ গিরিমালা হ'তে অসংখ্য নদী নেমে বয়ে চলেছে পূর্বদিকে সাগরপানে। সারা দেশময় ছড়ানো রয়েছে তুষারগলিত অঙ্গুলাকৃতি অসংখ্য হ্রদ। দেশটির উত্তরখণ্ড নদীবহুল ও পর্বতময়।

নরল্যাণ্ড প্রদেশটি হ'ল সুইডেনের ধনভাণ্ডার, বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদে ভরা। শিল্প ও বাণিজ্যে প্রধান কেন্দ্র হ'ল পূর্ব অঞ্চল, সেখানে গ'ড়ে উঠেছে কাঠের কারখানা, কাগজের কারখানা, লৌহ ও ইস্পাতের বিভিন্ন রকম কারখানা।

দেশে কয়লার অভাবে যথাসম্ভব তড়িৎ শক্তির সাহায্যেই কাজ চালানো হয়। পার্বত্য নদী ও ঝরণার সাহায্যে বৈদ্যুতিক

শক্তি তৈরি ক'রে অতি অল্প খরচায় সারা দেশময় সরবরাহ করা হয়। তাই বৈদ্যুতিক শক্তিতে ট্রেন ছুটেছে পুব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণে। দেশের অতি নিভৃত পল্লীর কোণটিতেও রেললাইন পাতা, সেখানে নিত্য সরবরাহ হয় মানুষের বাসের জন্য সকল অপরিহার্য দ্রব্য। জীবনযাত্রায় প্রয়োজনের দিক থেকে তাই শহর ও পল্লীতে বিশেষ পার্থক্য ঘটেনি। শহরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য গ্রামে ব'সেও মেলে।

এই সকল পার্বত্য স্থানে একটি বিশিষ্ট ব্যাবসা-পদ্ধতি হ'ল—স্রোতসঙ্কুল নদীর বুকে বড় বড় কাটা গাছ স্তূপাকারে ভাসিয়ে স্থানান্তরিত করা। শীতকালে বরফ-জমাট নদীর উপর গাছ কেটে বোঝাই ক'রে রাখা হয়; বসন্তের আগমনে বরফ গলা শুরু হ'লেই স্রোতের মুখে কাঠের বোঝা ভেসে চলে পুবদিকে। কারখানায় কাঠগুলি পৌঁছে সরাসরি চেরাই হয়, এবং পুব বন্দর হ'তে জাহাজ-বোঝাই কাঠ রপ্তানি হয় দেশ-দেশান্তরে।

দেখতে দেখতে আমরা গ্রামের পথ ছেড়ে উঁচু পার্বত্য ভূভাগে উঠে চলেছি। চারিদিকে শুধু তুষার আর তুষার। দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশির মত ঢেউ-খেলানো তুষার স্তূপ চারিদিকে জ'মে উঠল। শুধু সরু একটি গিরিপথ দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটেছে। ক্ষণমধ্যেই অগণিত গিরিমালা আমাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ ক'রে ঘিরে ফেলল। চিকণ কালো কঠিন পাহাড়গুলির মসৃণ দেহ ঘিরে জড়িয়ে আছে হৈম উত্তরীয়। সাদায় কালোয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সমাবেশ। দূরে নীল নিঃসীম গগনাঙ্গনে উজ্জ্বল রজত রেখায় টানা নীহারশৃঙ্গরাজি।

ট্রেনের একজন কর্মচারী এসে জানিয়ে গেল, এইবার আমরা সুমেরু সীমানার (Artic Circle) নিকট এসে পড়েছি। হঠাৎ ট্রেন তিনবার হুইসিল দিয়ে উঠল। জানালা দিয়ে দেখি অদূরে মাঠের মাঝে একটি সাইনবোর্ডে লেখা—"Artic Circle"—সুমেরু বৃত্ত। সাইন-বোর্ডের নিচে মাটির উপরের সাজানো সাদা পাথরের সারি গোল হয়ে বহুদূর অবধি ঘুরে চ'লে গেছে।

ট্রেন হু হু ক'রে ছুটল সুমেরু বৃত্তের ভিতর দিয়ে। শীতের তীব্রতা ক্রমেই যেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। বায়ুর স্বল্পতা বোধ ক'রে শরীর আনচান্ করছে। আমি কামরা থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে জানালার কাঁচ একটু তুলে দিলাম। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু বাইরের হালকা হাওয়া আসতে অনেকটা সোয়াস্তি বোধ হ'ল।

কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন দাঁড়াল ছোট্ট একটি স্টেশনে। কাঠের ঘরের স্টেশন, শুধু ট্রেনের ক্রু'রাই নেমে ঘোরা-ফেরা ক'রে আবার উঠে এল।

ছয়

চিরতুষার পথে—

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝির ঝির ক'রে ধূলিকণার মত তুষার ঝরা সুরু হ'ল। আমি জানালা বন্ধ ক'রে ক্রু'দের কাছে জানতে গেলাম ঘর আরো গরম করার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। তারা তাড়াতাড়ি আমাদের কুপেতে এসে তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে জানালে, ঘর পুরোমাত্রায় গরম করা আছে। মনে মনে বোধ হয় বিস্মিত হ'ল—এখন এই গ্রীষ্মকালে আবার এর চেয়ে গরম কারুর প্রয়োজন হয় নাকি। শীতের দেশের মানুষ এরা, বরফের মাঝে বাস করে; এরা আর কি ক'রে বুঝবে আমাদের শীত কি?

ট্রেনের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দেখলাম ট্রেনটি একেবারেই খালি। এসেছিলাম এক ট্রেন ঠাসা লোক, পথে নামতে নামতে অবশিষ্ট রয়েছি মাত্র দশ বারো জন বিদেশী যাত্রী।

ট্রেন ল্যাপল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে। চিরনীরব গুরু-গাম্ভীর্যপূর্ণ তুষার-প্রান্তরের সুগভীর স্তব্ধতা ভেদ ক'রে শুধু আমাদের বৈদ্যুতিক ট্রেনখানি ছুটেছে। বায়ু স্তব্ধ নিষ্কম্প, আকাশ সুশান্ত স্তব্ধময়; এখানে প্রতি শব্দটি দ্বিগুণ রবে ফিরে আসে কানে।

ল্যাপজাতি এদেশের আদিম অধিবাসী। প্রায় দু'হাজার বছর ধ'রে সারা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তরাংশে জেমট্‌ল্যাণ্ড অবধি

এরা ছড়িয়ে বাস করছে। ল্যাপরা জাতিতে মঙ্গোলিয়ান। এদের ভাষা কতকটা ফিন্ জাতির ভাষার মত। সুইডেনের অধিবাসীদের মধ্যে আরো একটি ভিন্ন জাতি রয়েছে, সে হ'ল ফিন্ জাতি। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিন্‌রা দলে দলে আসে এই দেশে এবং উত্তরে ও মধ্যপ্রদেশে বসবাস সুরু করে। এখনও এই অঞ্চলেই এরা বাস করছে। সুইডেনে সুইড্‌দের সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ, ফিন্‌দের পঁয়ত্রিশ হাজার ও ল্যাপরা ছয় হাজার মাত্র।

ল্যাপজাতির মধ্যে সাধারণতঃ দু'টি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়—ভ্রাম্যমান ও ফরেস্ট ল্যাপ্। ভ্রাম্যমানের দল বল্‌গা হরিণ শীকার ক'রে স্থানে স্থানে বেড়িয়ে বেড়ায়। বল্‌গা হরিণ পালন করাই হ'ল ল্যাপদের বৈশিষ্ট্য। শীতকালে এরা বল্‌গা হরিণের দলবল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে উপত্যকায়। সেখানে বনের ধারে বল্‌গা হরিণ ধরবার জন্যে কয়েক মাস বাস করে; আবার গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই পর্বতের উপরে উঠে চ'লে যায়।

ফরেস্ট ল্যাপদের জীবনযাপন কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের, অপেক্ষাকৃত উন্নত বলা যায়। এরা শিখেছে চাষের কাজ। তাই চাষ-আবাদের জন্য একই স্থানে প্রায় সারা বছর বাস করতে হয় এদের। বল্‌গা হরিণ লালনপালন করা, মাছ ধরা ও চাষ-আবাদ করাই হ'ল এদের প্রধান উপজীব্য।

এমনি জীবনধারার জন্য এদের বাসা বাঁধতে হয় সাময়িক-ভাবে। এদের তৈরি ছোট কাঠের তাঁবুগুলি দু'দিনের বাসা

বাঁধবার জন্য ভাঙাগড়া কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছে। তাঁবুর আকারে কয়েকটি কাঠের খুঁটি পুঁতে তার উপর চামড়া দিয়ে ঢেকে দিয় ঘাসের চাবড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ল্যাপদের কাঠের তাঁবু

কিরুণা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল অনেক ক্ষণ। আমরা স্টেশনে নেমে হেঁটে বেড়ালাম। স্টেশনটি অপেক্ষাকৃত বড়। যাত্রীর ভিড় নেই, তবে স্থানীয় লোকেরা মাল তোলা নামানোর কাজে বিশেষ ব্যস্ত। স্টেশনে অনেক ল্যাপও রয়েছে। এদের মুখাকৃতি চ্যাপ্টা গোলাকার; সুইড্দের মুখাবয়ব হ'তে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ল্যাপদের পোষাকপরিচ্ছদ অতি অদ্ভুত ধরনের—জমকালো গাঢ় ডগ্‌মগে রঙের।

কিরুণা শহর উচ্চ অধিত্যকার উপর গিরি-উপত্যকায় অবস্থিত। অগণিত লৌহখনি পর্বত-সানুদেশে দেখা যায়।

কানে আসে তরঙ্গ-চঞ্চল গিরি-নিঝরিণীর ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। দূরে নীল কুয়াশার পরদা-ঢাকা পাহাড়ের সারি আব্ছা আব্ছা ফুটে উঠছে। নীল পাহাড়ের কোলে হ্রদগুলি হিমরজের শ্বেত আস্তরণে ঢাকা। পাইনতরু-সমাকীর্ণ শ্যামস্নিগ্ধ উপত্যকার মাঝে সারি সারি কুঞ্জকুটীরগুলি যেন প্রকৃতির কোলে সুখময় নীড়।

কিরুণা শহর

সুইডেনের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—Kebnekaise এই স্থানেই রয়েছে; পর্বতটি উচ্চতায় প্রায় সাত হাজার ফুট। সম্প্রতি কিরুণায় তু'টি বিরাট লৌহময় পর্বতের অন্তর্নিহিত লৌহস্তর আবিষ্কৃত হওয়াতে ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করছে অতি

দ্রুত। ফলে, এই সব অঞ্চলে লোক-বসতি বৃদ্ধি পেয়ে গ'ড়ে উঠছে নতুন শহর। কিরুণার অধিকাংশ লৌহমাটি রপ্তানি করা হয় নরওয়ের নার্ভিক বন্দর হ'তে। সেই কারণেই নরওয়ের নার্ভিক শহর অবধি এই সুইডিশ রেললাইন পাতা।

রূপময়ী কিরুণায় শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুই পরম রমণীয়। শীতের ঘন তমসাবৃতা রজনীতে আকাশ-প্রান্তে সুমেরুজ্যোতি (Aurora Borealis) যখন জ্বলন্ত পাবকশিখার ফলকের মত চক্‌মকিয়ে ওঠে, তখন সেই নৈসর্গিক রূপৈশ্বর্য দেখতে দূর দূরান্তের যাত্রী আসে এই দেশে।

কিরুণা ছেড়ে ট্রেন চলল পর্বতসানুদেশের উপর দিয়ে। দেখতে দেখতে আমরা এক তুষার-রাজ্যে এসে পড়লাম। চারিদিকে সুদূরপ্রসারিত বিশাল তুষারময় মরুপ্রান্তর। কোথাও একটু তৃণকুটোও নেই। মাইলের পর মাইল তুষার পথ পেরিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়ালো Riksgransen স্টেশনে। রিক্সগ্রেনসন্ সুইডেনের উত্তরে শেষ সীমানার স্টেশন। ট্রেন থামতে আমরা আপাদমস্তক বেশ ক'রে গরম কাপড়ে ঢেকে স্টেশনে নেমে পড়লাম। বরফের স্তূপের মাঝে ছোট্ট স্টেশনের ঘরটি। কন্‌কনে শীতে দাঁড়িয়ে হাত পা অবশ হবার জোগাড়। শ্বাস-প্রশ্বাসের অল্প স্বল্প কষ্ট সর্বক্ষণই অনুভব করছি। তাড়াতাড়ি উঠে এলাম ট্রেনের গরম-করা কামরায়।

সাত

নরওয়ের পথে—

নরওয়েতে ট্রেন প্রবেশ করতেই পাশপোর্ট এবং শুল্ক-বিভাগের পরীক্ষা শেষ হ'ল ট্রেনের ভিতরেই।

ট্রেন চলল ধীরে ধীরে খাড়াই পাহাড়ের ধার দিয়ে, পাশেই সাগরসলিলপূর্ণ সুগভীর খাদ। কি ভীষণ ভয়াবহ ফিয়র্ডের দৃশ্য! ট্রেনের একজন চেকার আমাদের দেখিয়ে দিল, নিচে ওপারে ঐ ফিয়র্ডের জলের ধারে জার্মানদের সাব্‌মেরাইনগুলির কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে। ফিয়র্ডের পাড়ে জার্মানকর্তৃক প্রোথিত টেলিগ্রামের তার-গাঁথা লোহার খুঁটিগুলি বরাবর সাজানো রয়েছে। গত যুদ্ধে জার্মানরা নরওয়ে সাময়িক অধিকার ক'রে যেখানে যা-কিছু তৈরি করেছিল, আজও সে সকল সেই সব জায়গাতেই তেমনি ভগ্নাবস্থায় প'ড়ে আছে।

আমরা নার্ভিক পৌঁছলাম রাত আটটায়। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে ক'রে উপস্থিত হ'লাম রয়েল হোটেলে; পূর্ব থেকেই আমাদের ঘর রিজার্ভ করা ছিল।

আকাশে এখন মধ্যাহ্নের আলো। সূর্যদেব মাঝ-গগনে মেঘান্তরালে। এখানে রাত্রি নিরূপণ করতে হয় ঘড়ির কাঁটা দেখে, আকাশ দেখে নয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে রাতের কালিমা এ-দেশের আকাশকে মলিন করতে পারে না। দিবালোকে রাত্রি সমুজ্জ্বলা।

উপত্যকার মাঝখানে এই নার্ভিক শহর। ফিয়র্ডের ধারেই

আমাদের হোটেল। আমরা হোটেলে আহারাদি সেরে রাত বারোটায় শহর বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তার ধারে দোকান সব বন্ধ। পথে পথিক মাত্র দু'চার জন। গৃহস্থেরা সব জানালার পরদা টেনে রাতের আঁধার সৃষ্টি ক'রে ঘুমোচ্ছে। শহর নিঝুম। সূর্য হেলেছে ঈষৎ পশ্চিমে।

নার্ভিক শহর

সুইডেনের সীমানা পেরিয়ে যখন ফিয়র্ডের দেশে উত্তরাপথে এলাম, তখন ভেবেছিলাম রিক্সগ্রেনসনের মত সবটাই বুঝি বরফে ঢাকা দেশ হবে। নার্ভিকের শুকনো খট্‌খটে মাটি দেখে একটু দ'মে গেলাম।

নরওয়ে ফিয়র্ডে ভরা পার্বত্য দেশ। সারা দেশময় পাহাড়-কাটা ফিয়র্ডের গভীর খাদগুলি দেখে মনে এক ভীষণ ত্রাসের

সঞ্চার হয়। কোন এক অতীতকালে সেই তুষারের যুগে পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হ'তে থাকে, তখন পৃথিবীর মাটি বিশাল হিমবাহের ভারে নেমে পড়েছিল ;—এই সব মেরুপ্রদেশ তখন বিরাট বিরাট হিমবাহের স্তূপে ঢাকা। প্রকৃতির সেই অভূতপূর্ব রূপবৈচিত্র্য আমাদের কল্পনারও অতীত। কালে একদিন সেই সব তুষারপ্রবাহ পর্বত বিদীর্ণ ক'রে গভীর খাদ কেটে নেমে পড়ল সাগর-জলে, সাগরসলিল বয়ে এল খাদগুলিতে। সারা নরওয়ে দেশটাই হ'ল এই রকম বরফ-কাটা ফিয়র্ডে, দ্বীপে ও

নার্ভিক মোটর-বাস্-স্টেশন

হ্রদে সাজানো। পশ্চিমে সুদীর্ঘ সাগর উপকূল ঘিরে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। কোথাও ফিয়র্ডের জল ব'য়ে এসেছে দেশের মধ্য ভাগ অবধি। জলে ও পাহাড়ে দেশটি গাঁথা, সমতলক্ষেত্র যেন নেই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে আমাদের মনও নিরাশায় বিষাদাচ্ছন্ন হ'ল। এই সুদূর উত্তরমেরুর শেষ প্রান্তের কাছ বরাবর এসেও বুঝি নিশীথ সূর্যোদয়ের দর্শনানন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'ল!

আমাদের হোটেলে লোক অতি অল্প। তার মধ্যে এক মিশরবাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। তিনি এই সবেমাত্র ট্রম্‌সো (Tromso) শহর থেকে ফিরছেন। তাঁর কাছে শুনলাম ট্রমসোর আকাশ মেঘমুক্ত; সেখানে মধ্যরাত্রে সূর্যোদয়ের শোভা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। নার্ভিক থেকে ট্রম্‌সো যাবার পথের দৃশ্যও নাকি অতীব মনোরম। যাত্রাপথের সন্ধান পেয়ে আনন্দ ও উৎসাহে মন ভ'রে উঠল।

আট

উত্তরা পথে—

৩রা জুন, ট্রম্সোর (Tromso) পথে। বেলা দশটায় বাস-স্টেশনে উপস্থিত হয়েছি। মোটর-বাসটি বেশ বড় এবং আরামের। আমাদের মিশরবাসী বন্ধুটি স্টেশনে তুলে দিতে এলেন। যাত্রীরা একত্র হ'তেই আধঘণ্টার মধ্যে বাস রওনা হ'ল। মোটর-বাস খানিকটা গিয়ে একটি ফেরি স্টিমারে ক'রে বিরাট ফিয়র্ড পার হ'ল। ফিয়র্ডের জলের ধারে সরু পথ দিয়ে বাস চলেছে। জলের পারে ছোট্ট ছোট্ট গ্রামগুলিতে কৃষকদের বাস, তাদের ছোট্ট ক্ষেতগুলি শস্যে পরিপূর্ণ। উপত্যকার মাটি অতি উর্বর।

উঁচু নীচু পথে, হ্রদের ধারে, পাহাড় পেরিয়ে ক্রমেই আমরা উপরে উঠে চলেছি। কোথাও পথ চলেছে এঁকে বেঁকে পাহাড়-ঘেরা প্রাচীরের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা ঢালু পথ নেমেছে উপত্যকার মাঝখানে সুনীল জলরাশির ধারে ধারে।

নীল আকাশে হাল্কা মেঘের ওড়্না-ঢাকা। ফিয়র্ডের জল গাঢ় নীল, শান্ত, নিস্তরঙ্গ। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা 'সী-গ্যাল্' পাখীগুলি ফেনিল তরঙ্গের বিন্দু বিন্দু ফেনার মতো জলের উপর ভাসছে।

ফিয়র্ড পিছনে ফেলে বাস উঠে চলল সুবিস্তৃত মালভূমির উপরে। পথের দু'ধারে বৃহৎ বৃক্ষরাজি ক্রমেই ক্ষুদ্রকায় হয়ে

আসছে। পাহাড়ে-পথের পাথরটুকরাগুলো চাকার ঘায়ে ছিট্‌কে এসে বাসের গায়ে বেজে উঠছে ঝন্ ঝন্ শব্দে।

দেখতে দেখতে আমরা উত্তরাপথের চিরতুষারমেরু-মণ্ডলে প্রবেশ করলাম। চারিদিকে শুধুই তুষার—পথ ঘাট মাঠ
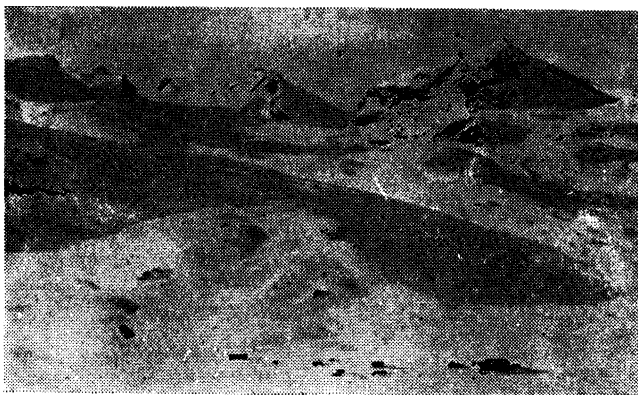
ট্রমসোর পথে—চিরতুষার মেরু

তুষারমণ্ডিত। সামনেই দেখা যায় অগণিত তুষার-কিরীট গিরিশৃঙ্গ নীল গগন-বেদিকা ঘিরে শ্বেতস্নিগ্ধ চিরতুষার-রেখার আল্‌পনা এঁকেছে। বিরাট হেমাদ্রির পাদমূল পরিক্রমা ক'রে বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। পথপ্রান্তে তুষারস্তূপের মাঝে অর্ধনিমজ্জিত তরুরাজি পর্বতসানুদেশ পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছে। মনে হয় ঐ শৈলশিখরে বুঝি রাজাধিরাজ গোলোকনাথ আসীন; পদপ্রান্তে তাই শত দ্বারী দ্বার আগলে দণ্ডায়মান। এই বুঝি লীলাকীর্তনের—

"সপ্তম দ্বার—পারে রাজা বৈঠত,
তাঁহা কাহা যাওবি নারী।"

ঐ মহা গিরিশৃঙ্গ ঊর্ধ্বে শ্বেতাম্বরে শুভ্র মেঘলোকে মিলিয়ে রূপে বর্ণে এক হয়ে গেছে।

মনে হ'ল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী যেন বিশ্বরূপের মাঝে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে—

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

কত যুগ যুগ ধ'রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের-মাঝে নিথর নিস্পন্দ তুষার এ ধরায় চিরমুক্তিকাশায়ী। এই তুষার-রাজ্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটে শুধু তুষারস্তূপের পর তুষারস্তূপ জ'মে,—শীতের পর শীত আসে অতি কঠিনরূপে, গ্রীষ্মের তাপ যেন এ দেশে নেই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা এই তুষার-মেরু পথ অতিক্রম ক'রে আমরা নেমে এলাম উপত্যকার মাঝে। ছোট্ট একটি পান্থশালায় বাস এসে থামলো। এখানে ১৫ মিনিট অপেক্ষা ক'রে কিছু কেক্, স্যাণ্ডউইচ ও কফি খেয়ে আবার গিয়ে বসলাম বাসে। মাইলের পর মাইল উত্তরমেরু-মণ্ডলের তুষারক্ষেত্র পেরিয়ে নেমে এলাম ফিয়র্ডের জলের ধারে।

গ্রামের পথ দিয়ে আমরা চলেছি। বাস থামছে স্থানে স্থানে। কোথাও দু'একটি যাত্রী বাস থেকে নেমে গ্রামের ভিতর আপন গন্তব্য স্থলে চ'লে যাচ্ছে, আবার কোথাও বা গ্রাম থেকে লোক উঠছে বাসে। ঘণ্টা দুই পরে বাস দাঁড়াল

ছোট একটি রেস্টুরেণ্টের সামনে। যাত্রীদের লাঞ্চ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এইখানে।

বাইরে প্রচণ্ড শীত; কিন্তু এই মোটর বাসের ঘর বেশ গরম করা। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার পথ চলা সুরু হ'ল।
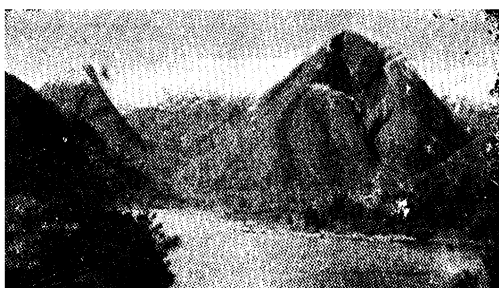
উত্তরা পথে ফিয়র্ডের দৃশ্য

শীতকালে নরওয়ের পশ্চিমে 'গাল্‌ফ স্ট্রিমে'র (Gulf Stream) উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়ে দেশটিকে হিমসাগরের হাত থেকে খানিকটা বাঁচায়। তাই সারা দেশময় জল জমাট বেঁধে কঠিন বরফে পরিণত হ'তে পারে না। নচেৎ এই সকল অঞ্চলে প্রাণীবাস একেবারেই অসম্ভব হ'ত, গ্রাম গড়ে' ওঠা তো দূরের কথা।

বেলা পাঁচটায় সূর্য ঠিক মাঝ-গগনে মাথার উপরে। আরো দু'ঘণ্টা তুষারপথ অতিক্রম ক'রে এসে সন্ধ্যা প্রায় সাতটায় ট্রমসো (Tromso) পৌছলাম। বাস-স্টেশনের কাছেই গ্র্যাণ্ড

হোটেল (Grand Hotel)। তীব্র শীতে বাইরে থাকা দায়! শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা হোটেলের দিকে ছুটে চলেছি। রাস্তায় নতুন দেশের মানুষ দেখে সবাই আমাদের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে। এই গ্রীষ্মকালে তাদের কারুর গায়ে রয়েছে হাল্কা গরম কোট, আর কেউ বা পরেছে শুধুই সিল্কের জামা।

নয়

নিশীথ সূর্য

দিগন্তবিস্তৃত তুষারশুভ্র পাষাণপুরীর মাঝে ট্রমসো শহর। শহরময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জের ন্যায় তুষারচূর্ণের স্তূপগুলি ছড়িয়ে রয়েছে ; আধাগলা তুষারে মাটি ভিজে স্যাঁৎসেতে।

আমাদের এই হোটেলটি একটি পাহাড়ের কোলে ; পাশেই রয়েছে আকাশ-ছোঁওয়া হিমানী গিরিশৃঙ্গ। শীতের দেশে পথশ্রমে শ্রান্তি আসে না। প্রায় ন' ঘণ্টা ধ'রে এই দুর্গম গিরিকান্তার পার হয়ে এসেও আমরা ক্লান্ত হইনি।

নিশীথ রাতের সূর্য দর্শনের মরশুম সবে সুরু হয়েছে, তাই হোটেলে যাত্রীর ভীড় এখনও বেশি হয়নি। হোটেল ম্যানেজার আমাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"যাত্রীরা এখানে আসেন মেরু-রজনীর সূর্যোদয় দেখতে। তাই হোটেল গৃহটি সৌরশোভা দেখার উপযোগী ক'রে বিশেষভাবে তৈরি করা। বাড়িটির সবার উপর-তলায় খোলা বারাণ্ডা হ'তে সূর্যোদয়ের শোভা অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়।"

পাঁচতলার সেই খোলা বারাণ্ডায় তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে সামনের গীর্জার ঘড়িটি দেখিয়ে বললেন—"রাত বারোটার কাছে কাঁটা ঘুরলে এখান থেকে পুব আকাশে সূর্যোদয় দেখা যাবে। অদূরে ঐ ফিয়র্ডের ধারে গেলে দেখতে পাবেন সূর্যের অস্ত ও উদয়ের গতি দিক-মণ্ডল মাঝে এক অপূর্ব রূপসৃষ্টি করেছে।"

মেরু রজনীর সূর্য

সারা শহরে এখন এই ছয়মাস বিজলী বাতি একেবারে নেভানো। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হ'তে ছয়মাস সূর্যকিরণ দিবারাত্র মেরুদেশের আকাশ উজ্জ্বল ক'রে রাখে। আবার শীতের ছয় মাস তেমনি উত্তরখণ্ড হ'তে সূর্য অন্তর্হিত হ'য়ে নিবিড় আঁধারে আকাশকে আচ্ছন্ন করে।

আকাশে এখন অপরাহ্নের আলো। সূর্য ঈষৎ পশ্চিমে হেলে।

রাতের আহার শেষ হ'লে হোটেলের গরম-করা ঘরে দুগ্ধফেননিভ শয্যার প্রতি খুবই লোভ হচ্ছিল, কিন্তু নিশীথ রাতের সূর্য দর্শনের উত্তেজনা আমার এই তন্দ্রালস বিশ্রামকে উপভোগ করতে দিল না। জয়শ্রী এবং ওঁর ক্যামেরায় ফিল্‌ম্ পোরা, মুভি ক্যামেরার লেন্স ঠিক করা এবং কখন কোন্ দিক থেকে সূর্যোদয়ের গতিবিধির ছবি তুলতে হবে—এই সব আলোচনা শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ উঠে দেখি ঘড়িতে ১২টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি আপাদমস্তক গরম কাপড়ে ঢেকে পাঁচতলার খোলা বারাণ্ডায় আমরা উপস্থিত হ'লাম।

বারাণ্ডায় আরো কয়েকজন যাত্রী ও হোটেলের কর্মীবৃন্দও এসেছেন। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝে খোলা বারাণ্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। দস্তানা ও মোজায় হাত পা ঢেকেও আঙুলগুলো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে গিয়ে বসছি গরম-করা বসবার ঘরে।

সূর্যের আলোয় দিক্ উজ্জ্বল। শহর নিঝুমপুরী। জনশূন্য

পথ। পথের দু'ধারে বাড়িগুলোর জানালায় গৃহস্থরা পর্দা টেনে রাতের অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে ঘুমোচ্ছে।

আমরা সবাই বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সূর্যের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব চিত্তে পুব আকাশ-পানে চেয়ে আছি।

নিশীথ সূর্যোদয় দর্শনার্থীদল—
গ্র্যাণ্ড হোটেলের পাঁচতলার অলিন্দে—ট্রমসো

গীর্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

অস্ফুট রক্তিমাভা দূর গগনে ফুটে উঠেছে। দিবালোকে পাহাড়ের আড়াল হ'তে সপ্তবর্ণ সৌরকররাজি দিক-বিদিকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়ল। সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্তে কাল বিলম্ব না ক'রে আমরা চ'লে গেলাম ফিয়র্ডের ধারে।
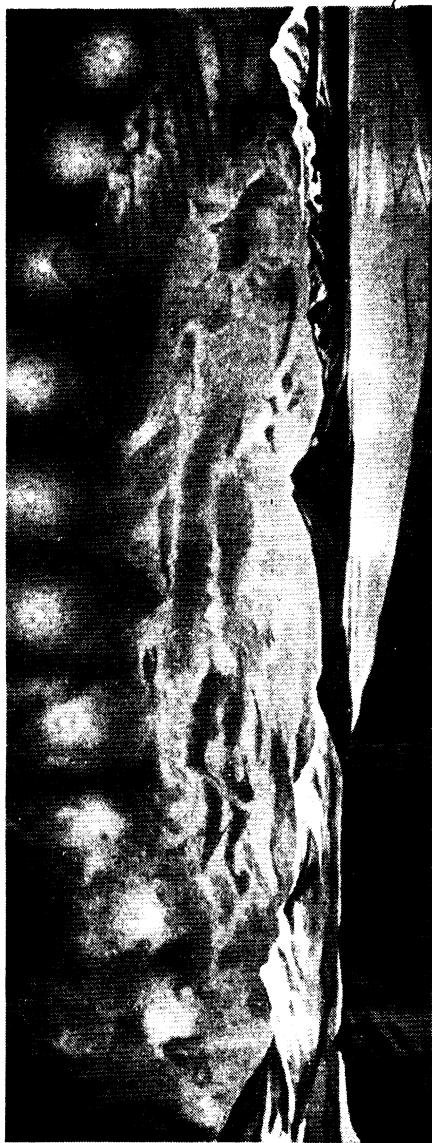
দিন বারোটায় সূর্য মাঝ-গগনে—
মহাব্যোমে অখণ্ড মণ্ডলাকার সৌরাবর্ত
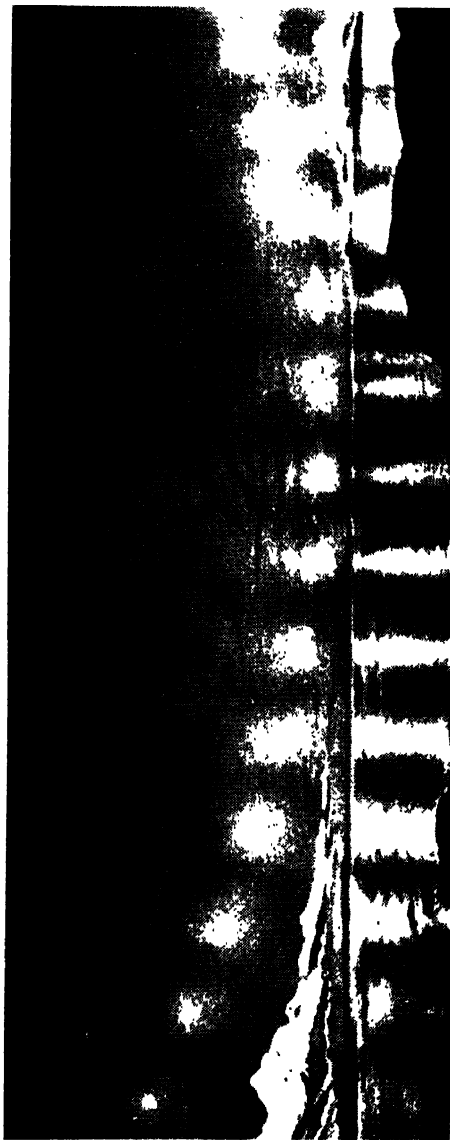
রাত্রি বারোটা—নিশীথ রাতে সূর্যোদয়।
সূর্য ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে নেমে আবার নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছে।
প্রতি ঘণ্টায় সূর্যের গতি চিহ্নিত হয়েছে।

নব রাগে রঞ্জিত সূর্যের লোহিত রথচক্রখানি ফিয়র্ডের জলের ধার দিয়ে অস্তাচলের পথে ধীরে ধীরে গড়িয়ে নেমে এল দিক্‌চক্রবালে,—আবার সে গতি ঘুরে অখণ্ড মণ্ডলাকারে ধীরে উঠে চলেছে মহাব্যোমে।

প্রশান্ত সলিলবক্ষে বিম্বে বিম্বে প্রতিফলিত হয়ে উঠছে সহস্র সূর্য। সংহৃতজ্যোতি কমনীয়কান্তি আদিত্য মহা-শূন্যলোকে আমাদের সম্মুখে ভাসমান। রুদ্রমূর্তি বিবস্বান এখানে ধী শ্রীরূপে দেবদ্যুতিতে বিরাজিত।

ঈশোপনিষদে বর্ণিত পুষণের কল্যাণতম দিব্যরূপ যে কি, তা জানি না; তবে যোগারূঢ় ঋষি যখন হিরণ্যগর্ভ পুষণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—

"পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

তখন কি তিনি এই শান্তভাতি সংহৃতরশ্মিই দেখতে চেয়েছিলেন?

বস্তুজগতের সৌরশোভা আমাকে এমনই মুগ্ধ ক'রে তুলেছিল যে ভুলে গিয়েছিলাম মহাযোগীর সাধনালব্ধ এই ধ্যানমূর্তিখানি সাধকের চেতনাময় অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার বিষয়, বহির্জগতের কোনো বস্তুর সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

স্নিগ্ধ সৌরকিরণে ঝলমল করছে বিপুল জলরাশি। অদূরে ঐ অগণিত তুষারমৌলি গিরিমালা। দূর দিগন্তে হীরকোজ্জ্বল শ্বেত শৈলরেখা। আকাশে লাল ফাগুয়ার রং গুলে কে যেন ঢেলে দিল দিক্-মণ্ডলে। সোনালি কিরণ ছড়িয়ে পড়ল দিকে

দিকে। আকাশপটে কোন্ সে শিল্পী এঁকে গেল এক সপ্তরঙা রবি।

নিশীথরাতে দিনের আলোর মাঝে সূর্যোদয়—এ এক অচিন্তনীয় নৈসর্গিক রূপচ্ছবি।

ফিয়র্ডের জলের ধারে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাত পা মুখ যেন কেটে যাচ্ছে। আমাদের ছবি তোলার পালা শেষ হ'লে ফিরে এসে গরম-করা মোটরের ভিতরে ব'সে কি আরামই না হ'ল !

তখন প্রায় রাত ছ'টো। শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। ফিয়র্ডের ধারে ধারে বহু জার্মান বিমান ও যুদ্ধজাহাজের কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে। ফিয়র্ডের ওপারে টিরপিড্ (Tirpid) যুদ্ধ-জাহাজটি বেশ বড়ই দেখলাম।

জার্মানরা জলপথে সাগর বেয়ে এসে এই ফিয়র্ডগুলির ভিতর দিয়ে দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে উপত্যকাস্থিত শহরগুলি বেশ কায়েমিভাবে দখল ক'রে বসেছিল। এই সুদূর পারে তুষারময় মেরুদেশ ট্রমসো শহরেও তাদের যুদ্ধ-জাহাজগুলি এসে পৌঁছেছিল। তারপর একদিন এখানেও এল ইংরাজদের বোমারু বিমান। টিরপিড্ জাহাজটি বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত হ'ল।

ছোট ছোট বহু বিমান নরওয়ের পথে ঘাটে এখনও তেমনি ভগ্নাবস্থায় প'ড়ে আছে। এই যুদ্ধে নরওয়ে জার্মান কর্তৃক সাময়িকভাবে অধিকৃত হওয়াতে জার্মানদের ব্যবহৃত নানা যুদ্ধ সরঞ্জাম আজও সারা শহরময় ছড়ানো রয়েছে।

দশ

অসলোর পথে—

৪ঠা জুন। ভোর ছ'টায় হোটেলের হিসাব চুকিয়ে ফিয়র্ডের জলের ধারে বিমানঘাটায় আমরা উপস্থিত হ'লাম।

ফিয়র্ডে ভরা নরওয়ের এই গিরিসংকুল উত্তরাংশ সমতল-ভূমিবিহীন। তাই বিমানঘাঁটির পথ স্থলপথে হয়নি, হয়েছে জলপথে। ফিয়র্ডের জল থেকে সী-প্লেন সরাসরি আকাশ পথে ওঠা-নামা করছে।

স্থির সাগর-সলিল। মেঘময় ধূমল আকাশ। ধূমায়িত দিক্-মণ্ডল। জলের দু'ধারে আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়ের সারি নিবিড় নীলাভ কুয়াশার মাঝে আবছা আবছা ফুটে উঠেছে। আমাদের সম্মুখে দৃষ্টিপথ রোধ ক'রে একখানি ঝাপসা মেঘের পর্দা ফেলা। প্রকৃতির এই ভৈরবী মূর্তি দেখে মনে ভয় হয়,—কেমন ক'রে এই ছায়াময় অস্ফুট গিরিকান্তার অতিক্রম ক'রে বিমান নির্বিঘ্নে আকাশ পথে ছুটবে!

প্রায় সাতটার সময় বিমান শূন্যে ওঠার সঙ্কেত জানাল। পরক্ষণেই জলপথে ছুটল ভীষণ গর্জন ক'রে তুফান তুলে। বিমান শূন্যে উঠে ঋজু পর্বতশ্রেণীর মাঝখানে গভীর খাদের পথ দিয়ে অতি ধীরে এঁকে বেঁকে ফিয়র্ডের জলরেখা অনুসরণ ক'রে উড়ে চলল। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ভয়ে আঁতকে উঠেছি—এই বুঝি পাহাড়ের গায়ে বিমানের ডানা দু'টি ধাক্কা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়! বিমানের ডানা দু'টি খাড়াই

ট্রমসো থেকে 'সী-প্লেনে' অসলো যাত্রা

পাহাড়ের গা ঘেঁসে যেন গাছের ডগা ছুঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘুরে, রাজপথে মোটর গাড়ি চলার মত চলেছে। ভয়ে জানালার পর্দা টেনে দিলাম।

স্টুয়ার্ডেশ তাড়াতাড়ি এল খাবারের ট্রে সঙ্গে নিয়ে,

যাত্রীদের মনোরঞ্জন করতে। ট্রে থেকে একটি স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে দিতেই কাঁচা মাছের আঁস্‌টে গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠল। এ যেন সমুদ্রের নোনা কাঁচা মাছ সদ্য তুলে এনে রুটির মধ্যে ভ'রে দিয়েছে। বিমানের এই বদ্ধ ঘরে কাঁচা মাছের দুর্গন্ধে থাকা দায়! আমার পাশের সহযাত্রীরা কিন্তু মনের আনন্দে একটার পর একটা স্যাণ্ডউইচ শেষ ক'রে চলেছেন।

আমরা প্রায় আধঘণ্টা এমনি ক'রে ফিয়র্ডের জলচিহ্ন অনুসরণ ক'রে উড়ে চলেছি। হঠাৎ দেখি বিমান ধীরে ধীরে নিচে নেমে জল স্পর্শ ক'রে দাঁড়াল। স্টুয়ার্ডেশ এসে জানাল—"আকাশের আবহাওয়া উড়বার পক্ষে অনুকূল না থাকায় বিমান এইখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। আবহাওয়া অফিস থেকে পুনরায় যাত্রার অনুমতি না আসা পর্যন্ত আমাদের এইখানেই অপেক্ষা করতে হবে।"

প্রায় এক ঘণ্টা নৌকোর মতো বিমান ফিয়র্ডের জলে ভাসছে। আকাশ তেমনি ঘোলাটে।

অল্পক্ষণের মধ্যে বিমান আবার শূন্যে ভাসল; ধীরে ধীরে উঠে এল আকাশের কোলে। নিচে প'ড়ে রইল বিশাল স্তব্ধতরঙ্গ পাষাণ পারাবার।

স্টুয়ার্ডেশ আমার কাছে এসে বললে—"বড়ই দুঃখের বিষয়, আকাশ মেঘলা ব'লে বিমান থেকে ফিয়র্ডের দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আশা করি একটু এগিয়ে আবহাওয়া ভালোই পাব। নরওয়ের ঐশ্বর্যই হ'ল এই ফিয়র্ড্। বিমান

থেকে ফিয়র্ডের সমগ্র দৃশ্য অতি মনোরম। সারা পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এমন দৃশ্য নেই।”

আমি জানালার ধারে ব’সে নরওয়ের রূপচ্ছবি দেখছি। আমাদের এই ছোট সী-প্লেনটি বেশ নিচে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। নরওয়ের সুদীর্ঘ বিস্তৃত পশ্চিম উপকূল অগণিত দ্বীপপুঞ্জে ঘেরা। দীর্ঘ পার্বত্য তটরেখা আঁকাবাঁকা ঋজু গিরিখাতে ভরা। কোথাও কোথাও সাগর-সলিল গিরিখাতের পথ দিয়ে দেশের মধ্যভাগ অবধি চ’লে এসেছে। দক্ষিণে অস্‌লো ফিয়র্ড হ’তে উত্তরের শেষ সীমানার ফিয়র্ড অবধি সুদীর্ঘ সাগরবেলা এমনি ভাঙা পাথরকাটা খাদে গাঁথা।

বিমান দেশের মধ্যভাগের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। চারিদিকে বিশাল তুষার-প্রবাহ রূপালী রঙে ঝক্‌মক্‌ করছে। নরওয়ের লোকবসতি দেখা যায় সাগর উপকূলে, উপত্যকার মাঝে, হ্রদ ও নদীর ধারে ধারে। হিমমেরুর অন্তর্গত এই উত্তরাংশটি অতি শীতপ্রধান।

নরওয়ে এক অতি সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাঙ্গ পার্বত্য প্রদেশ। পশ্চিম তীর দু’হাজার মাইলেরও অধিক দীর্ঘ। কিন্তু এ-হেন দেশ-মাতৃকাও তাঁর সন্তান-পালনে সক্ষম হননি। দেশটির চারভাগের তিন ভাগই হ’ল অনুর্বর ও পর্বতাকীর্ণ। চাষের জমি মেলে মাত্র শতকরা চার ভাগ; চব্বিশ ভাগ বনরাজিসমৃদ্ধ এবং বাকি সমুদয় ভূভাগই হ’ল দীর্ঘোচ্চ পর্বতমরুময়।

বিমান উড়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। নরওয়ের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগ ও ট্রণ্ডহাইম ফিয়র্ড ঘিরে ঘনকৃষ্ণ বনচ্ছায়ার শোভা অতি

অপূর্ব। পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় সাজানো নগর-সৌধাবলী। প্রকৃতির কোলে নিবিড়ভাবে মিলিয়ে আছে
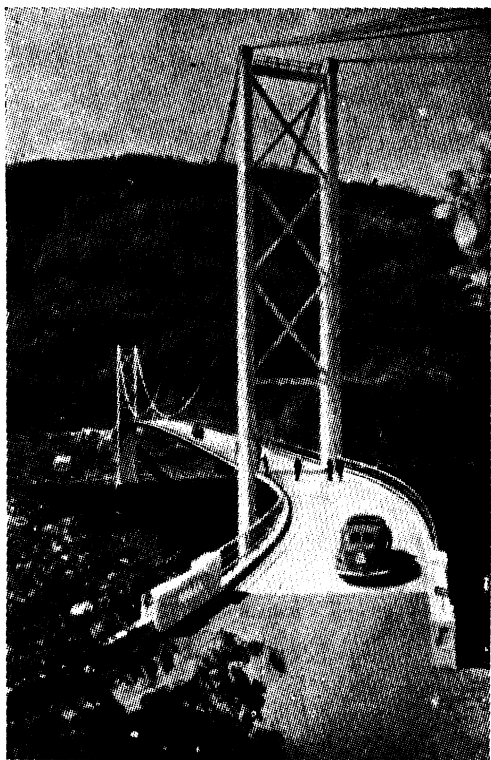
নরওয়ের সেতুগাঁথা রাজপথ

গিরিবর্ত্মের আঁকাবাঁকা ক্ষীণ তনুশ্রী। মাঝে মাঝে দেখা যায় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁধা বাঁকা সেতুগুলো। এই সেতু ভিন্ন

পাহাড়ের এ পারের সাথে ওপারের যোগ রাখা সম্ভব হয় নি। নরওয়ের পর্বতশ্রেণী ও বনানীর ভিতর দিয়ে প্রশস্ত মনোরম রাস্তাগুলি বিদেশীদের মোটর অভিযানের বিশেষ আকর্ষণের স্থান। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মনের নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব ক'রে যে পরম আনন্দময় নির্বাধ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে, তারই খোঁজে সে ফিরেছে যুগে যুগে সর্বদেশে সর্বকালে। তাই একদিকে যেমন গ'ড়ে উঠেছে জীবন-সংগ্রামের কঠিন বন্ধন দৃঢ় রূঢ় বাস্তব শহরগুলি, অপর দিকে তেমনি আবার ছুটে চলেছে প্রাকৃতিক রূপমাধুর্যে গড়া পার্থিব শোভা-সম্পদের মাঝে নিজেকে একান্ত ভাবে মিলিয়ে দিয়ে উদার অনাবিল মুক্ত প্রাণের আনন্দ উপভোগ।

বিমান অসলো অভিমুখে চলেছে। পাশে ফেলে রেখে এলাম ইউরোপের বৃহত্তম তুষার-ক্ষেত্র জস্‌টেডলসব্রিন (Jostedalsbreen) গ্লেসিয়ার। সন্‌ (Sogne Fjord) ফিয়র্ড ঘি'রে প্রায় ৫৮০ বর্গ মাইল ব্যাপী এর পরিধি। গ্রীষ্মকালে সারা ইউরোপবাসীর 'স্কী' খেলার প্রধান কেন্দ্রস্থল হ'ল এই শ্বেত-শৈল তুষার-প্রাঙ্গণটি।

রূপ মহীয়ান নরওয়েতেই ঘটেছে প্রকৃতির সকল রূপের সমাবেশ। তার উপর আবার সারা দেশজোড়া ফিয়র্ডের ভীষণ ভৈরব রূপটি দিয়েছে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের এক অভিনব ঐশ্বর্য।

বিমানে এক সহযাত্রীর সাথে আলাপ হ'ল, নাম মিস্টার গালার্স (Mr. Gullers)। তিনি সুইডিশ-গভর্নমেণ্টের

স্টাফ্ ফটোগ্রাফার। তিনিও ট্রমসো শহর ঘুরে ফিরছেন। সম্প্রতি গভর্নমেণ্টের তরফ হ'তে তিনি ছোট একটি দুই সিটের
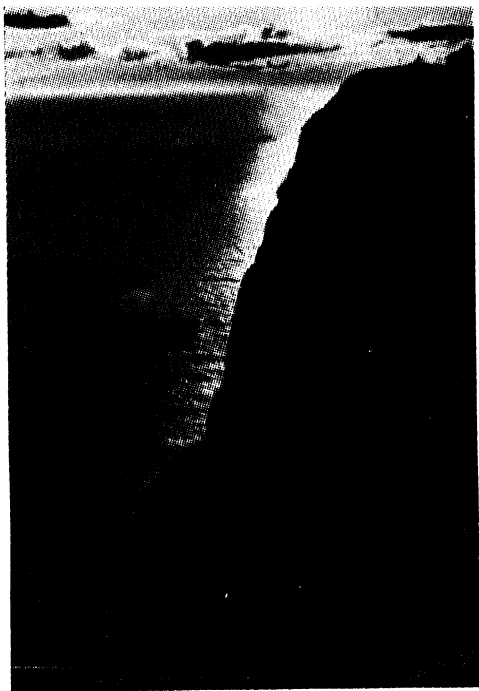
পৃথিবীর শেষ উত্তর প্রান্তে সূর্যোদয়— নর্থ কেপ্

বিমানে চ'ড়ে ট্রমসোর আরো উত্তরে হেমারফ্যাস্ট (Hammer-fest), স্পিট্‌স্‌বার্গ (Spitzberg) ও নর্থ কেপের (North Cape) উপর দিয়ে তুহিনাবৃত তুন্দ্রা প্রদেশে বেড়িয়ে এসেছেন। এই জুন মাসের প্রথমেও সে সকল দেশে নাকি পথ তুষারে

ফিয়র্ডের ধারে অস্‌লো শহর
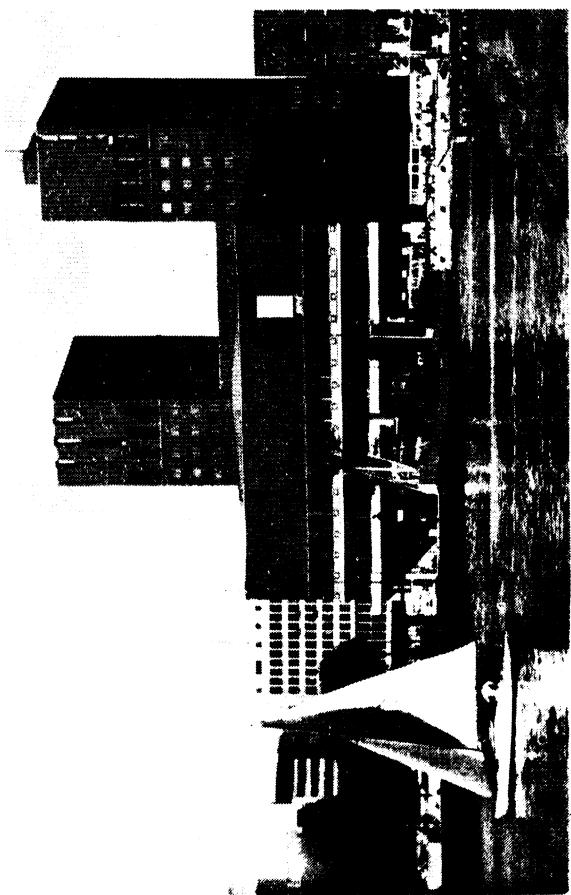
ঢাকা। কেবল ছোট ছোট নৌকোগুলো জলপথে এই সব দেশে যাতায়াতের সংযোগ রেখেছে। মিস্টার গালার্স তাঁর রোলিফ্লেক্স ক্যামেরায় তোলা নর্থ কেপের কয়েকখানি ছবি আমাদের উপহার দিলেন।

বেলা প্রায় একটায় বিমান অসলো ফিয়র্ডে নামল। ঘাটের সামনেই দেখা যাচ্ছে অসলোর সুরম্য টাউনহলের জোড়াবাড়ি।

আমরা K.N.A. হোটেলে গিয়ে ঘরে বাক্সগুলো রেখে হোটেলের রেস্টুরেন্টেই লাঞ্চ খেলাম। অখাদ্য খাবার, কিন্তু বিল এল বেশ মোটা রকমের।

সমৃদ্ধ সুইডেনের পাশেই রয়েছে এমন অভাবগ্রস্ত দেশ; যেন ঐশ্বর্যের পাশে দুর্ভিক্ষ! নরওয়ের যুদ্ধোত্তর অবস্থা যে এতটা শোচনীয় তা আগে ঠিক অনুমান করা যায় নি।

অস্লোর সর্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ প্রফেসার সুণ্ডের (Prof. Sunde) সাথে পূর্বেই লণ্ডনে আলাপ হয়েছিল। আমাদের পৌঁছনোর সংবাদ পেয়ে তিনি হাসপাতাল ফেরৎ হোটেলে দেখা করতে এলেন। প্রথমেই ঠিক হ'ল পরের দিন সকালে উনি হাসপাতাল দেখতে যাবেন। তারপর, নানারকম গল্প-গুজব ও চা পানের পর ডাক্তার সুণ্ডে তাঁর গাড়িতে ক'রে আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে বেরোলেন।

অস্লো শহর যেন প্রাণহীন। রাজপথ জনবিরল, পথের ধারে দোকানগুলির শো-কেস পণ্যাভাবে মলিন শ্রীহীন। দারিদ্র্যের করাল ছায়া সারা দেশকে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে।

প্রফেসর স্থণ্ডে (Prof. Sunde)
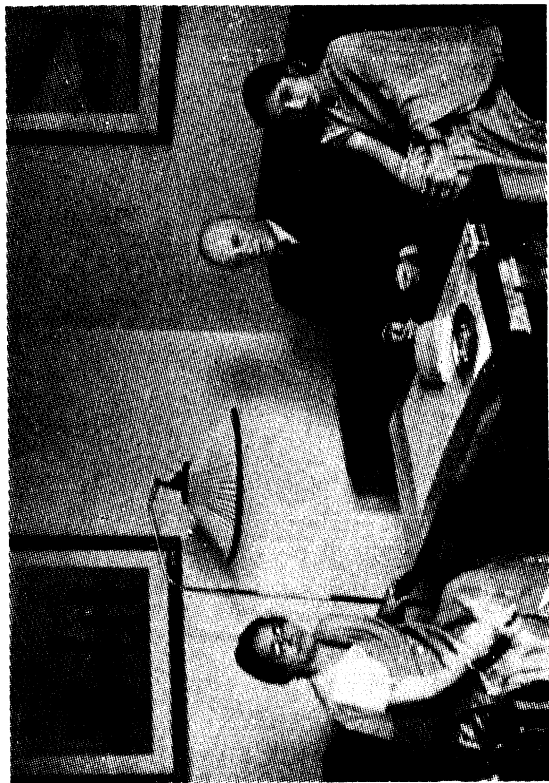
ডাক্তার স্থণ্ডের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হ'তে হয়। আমরা পৃথিবীর এতগুলো দেশ দেখেছি শুনে তিনি খুব আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তাঁর দার্শনিকতাপূর্ণ কথাগুলো শুনে আমার খুবই ভালো লাগল। কথায় কথায় তিনি ব'লে ফেল্লেন—তাঁর একমাত্র স্থযোগ্য ডাক্তার-পুত্র শরীরের সামান্য একটি লাল তিল থেকে ক্যানসার হয়ে সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন ডাক্তার। তাই এই দুরারোগ্য ব্যাধির সত্য স্বরূপটি তিনি নিজের দেহেই তিলে তিলে মর্মে মর্মে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুভব ক'রে গেছেন। বিধাতার এ কি পরিহাস! আমরা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে শুনলাম। ডাক্তার শুধু সজল নয়নে একটু হাসলেন।

এগারো

নরওয়ের লোকসংখ্যা মাত্র ত্রিশ লক্ষ, সুইডেনের প্রায় অর্ধেক। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান অনন্যসাধারণ, তাই মানব জীবন এখানে আয়েশের হয়নি, বরং কষ্টেরই হয়েছে।

দেশের এই অত্যল্প কঠিন মাটিতে বহু প্রয়াসে কায়ক্লেশে চাষ আবাদ ক'রেও দেশবাসীদের খাদ্যের অভাব মেটে না। শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ ঘাট্‌তি খাদ্য আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। এ-হেন দেশে এই ষাট ভাগ শস্য উৎপন্নও সম্ভব হ'ত না—যদি না গাল্‌ফ স্ট্রীমের উষ্ণ স্রোত সারা নরওয়ের পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলকে তরল ক'রে রাখত।

নরওয়ের এই স্বল্পবিত্ত কৃষকদের চাষ আবাদ ও পশুপালন বাদে বিভিন্ন রকম ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন হয় প্রচুর। কৃষকদের রয়েছে পশ্চিসাগর উপকূলে মাছের ব্যবসা, আর দেশের মাঝখানে যে সব বনানী রয়েছে তার কাঠ বেচেও তারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। দেশের প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ বন-সম্পদের মালিক হ'ল এই চাষীরা।

নরওয়ের গিরিবহুল সাগর-উপকূল ঘিরে বাস ক'রে নর-উইজিয়ানরা সাগরকেই সমতলভূমি ব'লে মনে করতে শিখেছে ; সাগর চ'ষে প্রচুর মৎস্য আহরণ করে। এই মৎস্য ব্যবসাই হ'ল এদের প্রধান উপজীবিকা।

নরউইজিয়ানদের মত নির্ভীক, দুর্দান্ত ও পরাক্রমশালী জাতি

বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। এরাই জলপথে চলতে অগ্রণী হয়ে জলযান নির্মাণের বিশিষ্ট কলাকৌশল জগৎকে শিখিয়েছে।

নরওয়ের পশ্চিম তীরে রয়েছে মাছ-ধরার বড় আড়ৎগুলি। পূর্বে শুধু কাঁচা মাছ চালান দেওয়াই ছিল এদের প্রধান ব্যবসা। এখন কিন্তু মাছ থেকে নানা রকম জিনিস তৈরি ক'রে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। দেশের আরো একটি প্রধান ব্যবসা হ'ল জঙ্গলের কাঠ কেটে চালান দেওয়া। কিছু-দিন যাবৎ শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে নতুন নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পূব সাগরের তীর এখন এই সব বড় বড় বন্দর ও কারখানায় ভ'রে উঠেছে।

নরওয়েকে বিদেশ থেকে আনতে হয় জীবনধারণের প্রায় সমুদয় প্রয়োজনীয় বস্তুই—খাদ্যশস্য, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, কাপড়, তেল এবং কারখানার সমুদয় যন্ত্রপাতি। তার পরিবর্তে সে দেয় বেশির ভাগই প্রাকৃতিক সম্পদ—বনের কাঠ, লোহামাটি, নানান্ ধাতু এবং প্রধানত মাছ। সম্প্রতি অবশ্য এই সব কাঁচা মাল থেকে বিভিন্ন রকম জিনিষ কারখানায় তৈরি হয়ে রপ্তানি হচ্ছে। মহাসাগরে তিমি ও শীল মাছ ধরার ব্যবসাও দেশের আয় বাড়িয়েছে।

দেশে আমদানির চেয়ে রপ্তানি অল্প, তাই অর্থের ঘাটতি নরওয়েতে এক রকম লেগেই আছে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ-গুলি কিনতে এদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয় বেশির ভাগ জাহাজ নির্মাণের ব্যবসা থেকে। বিদেশী টুরিস্টদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাতেও এদের বিস্তর অর্থ সাহায্য হয়।

এই ব্যাবসা-বাণিজ্যই হ'ল নরউইজিয়ানদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। সম্প্রতি তাই দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করবার জন্য কল কারখানা প্রসারের আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে।

নরওয়েকে বাঁচতে হ'লে চাই—সাতসাগরের পথে চ'লে ফি'রে 'বিকিকিনি' করার অবাধ স্বাধীনতা।

৫ই জুলাই। দুপুর বেলা হাসপাতাল থেকে উনি ও প্রফেসর স্থগে ফিরলে আমরা সবাই মিলে গেলাম ফ্রগনার পার্কে গুস্তাভ ভিগেলাণ্ডের মিউজিয়াম দেখতে। ডাক্তার
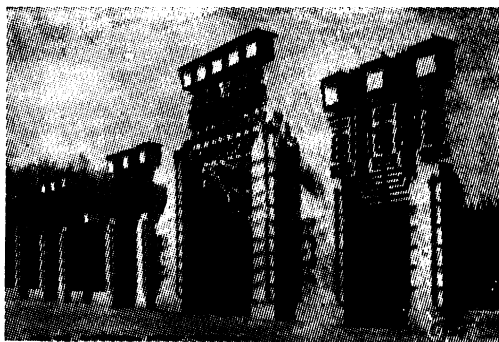
ভিগেলাণ্ড উদ্যানের প্রবেশ দ্বার

স্থগে বল্লেন,—এই ভিগেলাণ্ড ভাস্কর্য-শিল্প সম্বন্ধে মতদ্বৈত একদিন খুবই ছিল এবং আজও যে একেবারে নেই, তা নয়। একদল বলেন,—এমন অভিনব ভাস্কর্যের পরিকল্পনা করাই কঠিন, তায় আবার একটি মানুষের দ্বারা এক জীবনে

এত অসংখ্য সৃষ্টি! অপর দলের মত হ'ল,—ভিগেলাণ্ড ভাস্কর্যের ভিতর শিল্পের মৌলিকত্বের অভাব আছে।

প্রফেসর সুণ্ডে বেশ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, বিদেশী আগন্তুককে তাই আমরা প্রথমেই বলি নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে দেখতে। শিল্পের উভয় দিকই যখন রয়েছে, তখন এর মতামত নির্ভর করছে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব কৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

ভিগেলাণ্ড পরিকল্পিত উদ্যানের প্রবেশদ্বারগুলি অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যময়। বাগানের মধ্যে বহু বিদেশী যাত্রী ও স্থানীয় শহরবাসী মুক্তবায়ু সেবনের জন্য আরামে আয়েশে, কেউ বা মাঠে মৃদু পদচারণা করছেন, আর কেউ বা কাননবীথির ছায়ায় ব'সে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করছেন।

প্রবেশ-দ্বারের পরেই রয়েছে বনবীথিকায় ঘেরা সাজানো বাগান; অদূরে একটি ছোট্ট নদীর উপর সুরম্য সেতু। সেতুর দু'পাশে সাজানো ধাতুনির্মিত শিশুমূর্তিগুলি চারুকলার এক অভিনব সৃষ্টি।

মূর্তিগুলির মধ্যে সাধারণ জীবন যাপনের গতিভঙ্গি দিয়ে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন—শৈশবকাল হতে শিশুর মনোগঠনের ক্রমবিকাশ। শিল্পী একদিকে দেখিয়েছেন যে জীবনের প্রারম্ভে উৎসাহ ও প্রেরণা পেলে শিশু কেমন বলিষ্ঠচিত্ত, উদ্যমশীল ও কর্মপ্রবণ হয়ে পূর্ণ মানবে পরিণত হয়। আবার অপর দিকে দেখিয়েছেন—উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাবে শিশু কিরূপ নিরুদ্যম, সঙ্কীর্ণমনা ও কর্মবিমুখ হয়ে ওঠে।

ভিগেলাণ্ড মনোলীথ স্তম্ভ
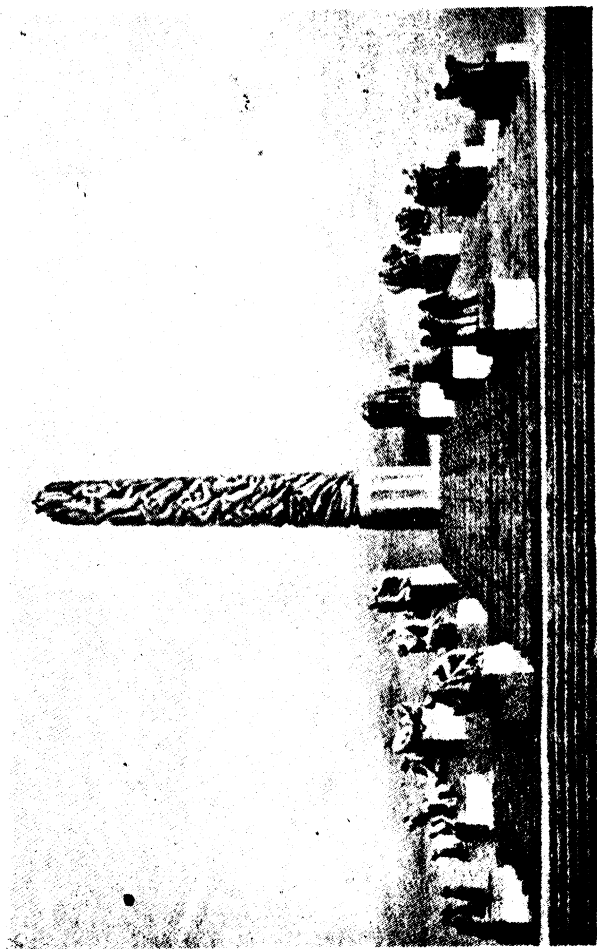
উদ্যানের মাঝ বরাবর রয়েছে একটি বিরাট পাথরের জলাধার। ছয়টি বলিষ্ঠ শিলামূর্তি এই জলাধারটি মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পাত্রটির গা বেয়ে ফোয়ারার জল উপচে পড়ছে। এর চারিধার ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি কুড়িটি বৃক্ষারূঢ় মূর্তি। শিল্পী এই পাষাণের বুকে অভিনব রূপকল্পনায় দেখিয়েছেন—বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য প্রকাশের মাঝে মানব জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির কি মধুর একাত্মিক মিলন। এই সমগ্র শিল্প-রচনাটির নিগূঢ়ার্থ বোধ হয় এই যে, মহাবিশ্বের উৎসের তলায় মানব-জীবনধারা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে সৃষ্টির আদিকাল থেকে কেমন ক'রে ব'য়ে চলেছে।

ভিগেলাণ্ড সাধারণ মানব-জীবনকে অবলম্বন ক'রেই এই শিল্পরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টি পুরাণের বিশিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে নয়, কিংবা ধর্মগ্রন্থের উপদেশাবলীও তাঁর বিষয়বস্তুতে স্থান পায়নি। শুধু দোষেগুণে-গড়া সাধারণ মানব-জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের উপাদান নিয়েই শিল্পী নগ্ন পাষাণ মূর্তিগুলির ভিতর যেন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছেন। শিল্পের মধ্যে রয়েছে গতিভঙ্গির চরম অভিব্যক্তি।

খানিকটা দূরে উঁচু বেদীতে বিরাট একটি গ্র্যানাইট প্রস্তরের স্তম্ভ স্থাপিত। স্তম্ভের গায়ে খোদাই-করা অগণিত মানব-মূর্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে একটির পর একটি জড়িয়ে আছে। এই স্তব্ধ সৃষ্টির সুমহান পরিকল্পনাটি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদান। চারুকলার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে শিল্পীর প্রগাঢ় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

স্তম্ভগাত্রে শিল্পী দেখিয়েছেন মানব-জীবনের ক্রমবিবর্তনের স্তর—সুপ্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন অচেতন জীবনস্তর হ'তে জাগ্রত চেতনাময় আলোকের পথে মানব-জীবনের ক্রমবর্ধনগতি। শিল্পীমনের চরম দার্শনিক অভিব্যক্তি এই স্তম্ভে রূপায়িত হয়েছে। স্তম্ভটি যেন মানব জীবনের শাশ্বত জিজ্ঞাসার প্রতীক।

গুস্তাভ ভিগেলাণ্ডের এই মিউজিয়মটিতে তাঁর সারা জীবনের শিল্পসাধনা রক্ষিত হয়েছে। শিল্পী এক জীবনে স্বীয় প্রচেষ্টায় কাহারো পৃষ্ঠপোষকতা না নিয়ে বরং জীবনাবধি বাধা পেয়ে ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে কেমন ক'রে যে এত বড় অবদান জগৎকে দিয়ে যেতে পারলেন, তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক্ হতে হয়। ভিগেলাণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে কৃতী হবার মূলে প্রধান অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন বিশ্ববরেণ্য ফরাসী শিল্পী রোঁদা (Rodin)।

আমি শিল্পী নই, ভাস্কর্য-শিল্পের রসাভিজ্ঞও নই। তবু আমার মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে শিল্পসৃষ্টির যে রূপটি ধরা পড়েছে, তাতে দেখেছি পাষাণমূর্তির দেহসৌষ্ঠবে যেন কমনীয় সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির অভাব রয়ে গেছে ; দেহলতা যেন লাবণ্যরস-সিঞ্চনে বঞ্চিত হয়েছে ; স্বভাব-সুন্দর এই মানব-দেহ যেন তেমন কোমল মাধুর্যের স্পর্শ পায়নি—সত্যই যা' ইতালীয় ভাস্কর্য-শিল্পে অনুভব করা যায়। ভিগেলাণ্ড-ভাস্কর্যে প্রাণের সজীবতা ও উদ্দামতা আছে, কিন্তু ইতালীয় ভাস্কর্যের সুমধুর কমনীয়তা নেই।

বারো

ভাইকিং যুগ

৬ই জুলাই। আজ সকালে শহরের দক্ষিণে বিগড্যোতে (Bygdoy) ভাইকিং (Viking) মিউজিয়ম দেখতে যাব। প্রফেসার স্থুণ্ডের মুখে ভাইকিং-যুগের অনেক তথ্যই শুনেছি। পূর্ব পুরুষদের এই নির্ভীক সাগর-অভিযানের বিষয় গল্প করবার সময় প্রফেসার স্থুণ্ডের মত ধীর স্থির প্রবীণ ব্যক্তিও পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। খুব গর্বের সঙ্গেই বললেন যে, আমেরিকা কলম্বাস আবিষ্কার করেন নি তার বহু পূর্বেই নরওয়েবাসীরা আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেছিল। তিনি বললেন—অস্লোয় এসে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভাইকিং মিউজিয়ম না দেখে গেলে নরওয়ে প্রবাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মিউজিয়মের মধ্যে গেলে নাকি ভাইকিং যুগের দিনগুলো ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

নরওয়ের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও তৎকালীন দেশের আর্থিক অবস্থাই ছিল এই ভাইকিং-যুগ-সৃষ্টির মূল কারণ। প্রায় অষ্টম শতাব্দী হ'তে দশম শতাব্দী পর্যন্ত দুইশত বৎসর কাল ভাইকিং-যুগ নামে পরিচিত।

ভাইকিং মিউজিয়মের ভিতরে তিনটি প্রাচীন দাঁড়বাহী জাহাজ রয়েছে, অসেবার্গ (Oseberg), গক্স্টেড্ (Gokstad), ও টিউন (Tune)। এগুলি দেখে মনে হ'ল, এ যেন আমাদের সেই সাবেক কালের ময়ূরপঙ্খী। জাহাজগুলি

ওক কাঠের তৈরি, অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত। অসেবার্গ জাহাজটির ভিতর সূক্ষ্মকাজের বুদ্ধ বালতিটি (Buddha bucket) দেখে বিস্ময় জাগে। এই জাহাজটির তলদেশ গোলাকার—ভেলার মতো; এটি অগভীর জলে ভাসার

সাবেকি ভাইকিং জাহাজ

উপযোগী। গক্স্টেড্ জাহাজখানি সাগরের গভীর জলে যাতায়াতের মত তৈরি করা।

সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এইরূপ জলযান নির্মাণে নরওয়ে-বাসীদের যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাজগুলি যুগ যুগ ধ'রে অস্‌লো ফিয়র্ডের তীরে মাটি চাপা প'ড়েছিল। এই সব জাহাজের একখানিতে একটি নারীদেহের কঙ্কালও পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে দুঃসাহসী নরওয়েবাসীদের এই সকল অভিযানে নারীদেরও অংশ ছিল।

প্রায় দুইশত বৎসর ধ'রে এই ভাইকিং-যুগ চলল। নরওয়েতে তখন লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাব ও স্থানাভাব অতি তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে; ফলে সেই সময় হ'তেই উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা হ'ল। সীথল্যাণ্ড (Shetland), গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland), আইসল্যাণ্ড (Iceland) প্রভৃতি কাছাকাছি দ্বীপগুলিতে, এমন কি আরো দক্ষিণে ইউরোপের নানা স্থানে গিয়ে নরওয়েবাসীরা বসবাস সুরু করল। স্থানের অভাব এ ভাবে মেটানো গেলেও, দেশে তখন ব্যাবসা ও বাণিজ্য আদবেই উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল না, তাই দেশবাসীর অর্থের অভাব ও খাদ্যের অভাব ঘুচল না। এ হেন অবস্থায় প'ড়ে নরওয়েবাসীরা বেরিয়ে পড়ল সাগর-পথে জীবনধারণের উপায় সন্ধানে। নৌযান নির্মাণ ক'রে সাগর জলে ভেসে চলল তারা বিদেশ থেকে অর্থ ও ধনসম্পদ লুঠ ক'রে আনতে। সারা ইউরোপ তখন এই দুর্ধর্ষ জলদস্যুর নামে ভীত-কম্পিত।

ঘর-ছাড়া এই জলদস্যুর দল সাগর-পথ এমনিভাবে চিনে জেনে নিয়ে নিয়ত আনাগোনা ক'রে কালে হয়ে উঠল এক নির্ভীক অভিযানেচ্ছু শ্রেষ্ঠ নৌবিদ্যাবিশারদ জাতি।

আমরা ভাইকিং মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে ন্যানসেন (Fridtj of Nansen) ও এমুণ্ডসেনের (Roald Amundsen) মেরু-অভিযানের ফ্র্যাম (Fram) জাহাজটি দেখতে গেলাম।

দুর্ভেদ্য সাগর-বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-অভিযানে

নরউইজিয়ানরাই এগিয়েছিল প্রথম অভিযাত্রী হয়ে। এমুণ্ডসেন ও ন্যানসেন তাঁর সহযাত্রী সমেত দুর্জয় বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে ও জীবন বিপন্ন ক'রে বার বার অগ্রসর হয়েছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিযানে। এই মিউজিয়মে সযত্ন-

এমনি ক'রে যাত্রা করেছিল একদিন
মেরু-অভিযানে ফ্র্যাম জাহাজখানি
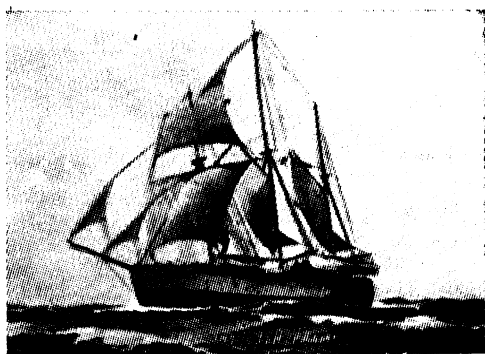
রক্ষিত বিরাট জাহাজখানি বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও দারুণ দুঃসাহসিক মেরু-অভিযানের সাক্ষ্য প্রদান করে। এই সব অভিযানে তুষার মেরুবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে যখন জাহাজ আর অগ্রসর হ'তে পারত না, তখন স্কী-ক্রীড়া-পারদর্শী ন্যানসেন স্কী এবং শ্লেজগাড়ির সাহায্যে তুন্দ্রার তুষারমণ্ডল অতিক্রম ক'রে উত্তরমেরুর শেষপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন।

এমুণ্ডসেনের শেষ অভিযাত্রায় জীবন অবসান ঘটে

বিমানে। দুর্গম গিরি-লঙ্ঘনের পথে একটি পাহাড়ের গায়ে বিমান ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'ল।

প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের অন্বেষণে যিনি আজীবন ছুটেছিলেন, তিনি ঐ প্রকৃতিরই স্নেহক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করলেন।
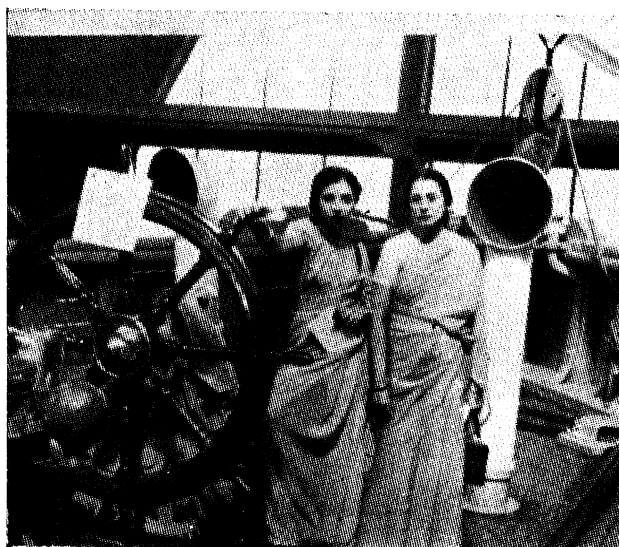
মিউজিয়ামে রক্ষিত ফ্র্যাম জাহাজের অভ্যন্তর

কঠোর ও কোমলের এই অপূর্ব সমাবেশ নরওয়েবাসীদের চিত্ত-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন দেখতে পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোনও জাতির ভিতর দেখা যায় না।

প্রকৃতির নির্মম ঘাত-প্রতিঘাতে একদিকে যেমন এরা হয়ে উঠল দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক সাগর অভিযাত্রী, অন্যদিকে তেমনি

আবার সেই প্রকৃতিরই মাধুর্যভরা স্নেহ-সুষমার আবেষ্টনে একাত্ম হয়ে বাস ক'রে গ'ড়ে উঠল কত প্রকৃতিপ্রিয় কবি, ভাববিলাসী-শিল্পী ও সাহিত্যিক।

নরওয়ের এই পাষাণী মূর্তির ভিতরে যে এমন প্রাণময় নৈসর্গিক রূপচ্ছন্দের স্পন্দন রয়েছে তা সত্যই পৃথিবীর মাঝে অতুলনীয়।

চিত্র-সূচী

শ্রীসুষমা মিত্রের আর একখানি ভ্রমণ-কাহিনী

আকাশ পথের যাত্রী

সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

"The book under review, judged by every test, is a pleasing travel diary. The authoress here presents her account of travelling the world by air in simple language and her narration has an informative value at the same time. Sight-seeing is of secondary interest to her ; she went with a mind to get not only the glimpse of the places but their social and cultural features as well. We have no doubt that the reader will be profitably delighted to share her experience. Printed in art paper, the book contains a number of photographs of different places she visited."

—Amrita Bazar Patrika.

"...আকাশ পথের যাত্রী" লেখিকার প্রথম পুস্তক, কিন্তু গল্প বলার ভঙ্গীটি লেখিকা আয়ত্ত করিয়াছেন। নিজের চোখ দিয়া বিভিন্ন দেশ ও তাহাদের সমাজগত বৈশিষ্ট্য এমন কি বিদেশের বিজ্ঞান-তপস্বীদের একান্ত চিত্র ও ভাব তিনি যেমনভাবে দেখিয়াছেন ঠিক তেমনিভাবেই পরের কাছেও মনের ভাবটি স্থকৌশলে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন। এইখানেই তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। সরল অনাড়ম্বরভাবেই তিনি একের পর এক চিত্র আঁকিয়াছেন, কষ্ট কল্পনা অথবা পাণ্ডিত্যের প্রয়াস কোথাও প্রকাশ পায় নাই। সেই জন্যই বইখানি পড়িয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়।

"দামী আর্ট পেপারে ছাপা, বহু চিত্রশোভিত বইখানির অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

"...... লেখিকার ভাষা মনোরম এবং সহজ আন্তরিকতায় সুন্দর। তিনি যেখানে যেমন দেখিয়াছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ......বইখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এবং কোনো বাঙ্গালী মহিলা এ রকম ভ্রমণ-কাহিনী ইতিপূর্বে লেখেন নাই—সে দিক দিয়াও ইহার একটি বিশেষ মূল্য আছে।"

—যুগান্তর

"......এই গ্রন্থে লেখিকা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও ডলারস্ফীত আমেরিকার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তথ্যের দিক দিয়া যেমন মূল্যবান, ঘরোয়া বর্ণনাভঙ্গির জন্য তেমনি সুখপাঠ্য। লেখিকা তাঁহার নারীসুলভ দৃষ্টিতে সে-দেশের সাংসারিক জীবনের যে চিত্র এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা সাম্প্রতিক প্রকাশিত অন্য কোন ভ্রমণ-কাহিনীতে পাওয়া যায় না।......বইখানি পাঠক-চিত্তকে শুরু হইতেই যেভাবে আকর্ষণ করে, এক নিঃশ্বাসে পাঠ শেষ না করিয়া উপায় নাই। ইহা ছাড়া সাম্প্রতিক ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত মনীষী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিশারদ ও সমাজ সেবকের সহিত লেখিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের মনে ঔৎসুক্য জাগায়।"

—দেশ

"......নারীর দৃষ্টিতে খুঁটিনাটি বস্তুও এড়ায় না। নারীসুলভ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ঐ সকল দেশের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা সমুদয় লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সব স্থানের উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষা, কলকারখানা, আমোদ-প্রমোদের আয়োজনাদি কথার উল্লেখ করিতেও লেখিকা ভুলেন নাই।

"ডাবলিনে ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে কথোপকথন সংক্ষিপ্ত হইলেও শিক্ষাপ্রদ। পুস্তকখানির পাতায় পাতায় ছবি লেখিকার সরল বর্ণনা-শৈলী চিত্রাদি সহযোগে বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলীকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"

—প্রবাসী

"শ্রীমতী সুষমা মিত্রের 'আকাশ পথের যাত্রী' বইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। লেখিকার ভাষা স্বচ্ছ ও সরল, তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক ও তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা ছবির মত উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির অধিকারিণী। তাঁহার লেখার সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ এই যে ইহা অযথা তত্ত্বকণ্টকিত বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের অভিমানে গুরুভার নহে। নারীর সূক্ষ্মদর্শিতা ও নূতন দৃশ্যে ও নূতন রীতিনীতির অভিজ্ঞতায় নারীজাতিসুলভ স্বত-উৎসারিত আনন্দ কৌতূহল তাঁহার বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ..... মাঝে মধ্যে যে এক আধটু মননশীলতার পরিচয় আছে তাহাও লেখিকার অন্তরের কোমলতায় পরিপ্লুত। তাঁহার সুখপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনীটি সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত নহে বলিয়াই ইহা সাহিত্যের কোঠায় স্থান লাভ করিবে।"

—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়